POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

## আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَا تَنۡقِمُ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنۡ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ
رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتۡنَا ؕ رَبَّنَاۤ اَفۡرِغۡ
عَلَيۡنَا صَبۡرًا وَّتَوَفَّنَا مُسۡلِمِيۡنَ۠

এবং তুমি আমাদের উপর শুধু এই জন্য প্রতিশোধ লইতেছ যে, আমরা আমাদের প্রভুর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনিয়াছি, যখন ঐগুলি আমাদের নিকট আসিল। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে ধৈর্য দান কর এবং আমাদিগকে আত্ম-সমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও।'

(আল আরাফ: ১২৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدۡ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 10

# বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 41

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 9 Oct, 2025 16 রবিউস সানি-1447 A.H

## আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

## মহানবী (সা.)-এর বাণী

### যথাস্থানে সম্পদ খরচ করার এবং অপরকে শেখানোর শ্রেষ্ঠত্ব।

১৪০৯) হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে; নবী (সা.) যখন আমাদেরকে সদকা করার আদেশ দিতেন, তখন আমাদের মধ্যে কেউ বাজারে গিয়ে সেখানে মুটের কাজ করে এক 'মুদ' অর্জন করত, আর এমন অবস্থা যে তাদের অনেকের কাছে এক লক্ষ করে (দিনার) আছে।

১৪১৭) হযরত আদ্দি বিন হাতিম (রা.) বর্ণনা করেন, 'আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে বলতে শুনেছি, 'আগুন থেকে রক্ষা পাও, এক টুকরো খেজুর দানের মাধ্যমে হলেও।

১৪১৮) হযরত আয়েশা (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক মহিলা উপস্থিত হল, যার সাথে তার দুই মেয়ে ছিল।সে যাচনা করছিল। আমি নিজের কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই পেলাম না। আমি তাকে সেই খেজুরটি দিলাম। সেই মহিলা খেজুরটি তার দুই মেয়ের মধ্যে ভাগ করে দিল, নিজে খেল না। এরপর সে উঠে বাইরে চলে গেল। এরপর নবী (সা.) আমার কাছে এলে আমি তাঁকে সমস্ত ঘটনা শোনালাম। তিনি (স.) বললেন, 'যে এই মেয়েদের কারণে কোন কষ্টে নিপতিত হয়, তার জন্য এই মেয়েরা আগুনের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

(সহীহ বুখারী, ৩য় খণ্ড,কিতাবুয যাকাত, কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত)

## এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১৫ আগস্ট ২০২৫
খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
হুযুর আনোয়ার (আই.) এর অনলাইন সাক্ষাত ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্নোত্তর।

# প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়ে অতিরিক্ত উগ্রতা প্রদর্শন করা উচিত নয়।

## হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

### পরীক্ষা

বিশ্বাসীগণ প্রায়ই দুঃখ-কষ্ট ও পরীরক্ষার সম্মুখীন হন- এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

এক ব্যক্তি একবার হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট এসে তাঁর কন্যার বিবাহের প্রস্তাব পেশ করলেন। কন্যার প্রশংসাস্বরূপ তিনি অন্যান্য গুণাবলীর পাশাপাশি এই কথাও উল্লেখ করলেন যে, যদিও সে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েছে, তবুও সে কখনও কোন রোগে আক্রান্ত হয় নি। তখন হযরত রসুলুল্লাহ্ (সা.) উত্তর দিলেন: "যাদেরকে আল্লাহ্ ভালবাসেন,তাদের উপর তিনি অবশ্যই দুঃখ-কষ্ট ও পরীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষা নেন।"

আপনারা বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন , আর এটি আপনাদের মধ্যে একটিট প্রশংসনীয় গুণ। পরীক্ষার মাত্রা যত বড় হয়, পুরস্কারের পরিমাণও তত বড় হয়; যেমন কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে -اِنَّ مَعَ الۡعُسۡرِ يُسۡرًا

অর্থাৎ "নিশ্চয় কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি"

(আল-ইনশিরাহ: ৭)

### প্রতিপক্ষের সঙ্গে আচরণ

কিছু বিরোধীদের প্রসঙ্গে, যারা আমাদের সঙ্গীদের প্রতি কঠোর আচরণ করে এবং তাদের কষ্ট দেয়, তিনি তাঁর অনুসারীদের ধৈর্য, ক্ষমাশীলতা এবং প্ররোচনা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন:

"প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়ে অতিরিক্ত উগ্রতা প্রদর্শন করা উচিত নয়। এ বিষয়ে আমি বিশেষভাবে তরুণদের উপদেশ দিচ্ছি। তোমাদের আমার কাছে প্রায়ই আসা জরুরী, কেননা আমার পর কতদিন তোমরা বাঁচবে, তা তোমরা জান না। নিকটে থাকা অনেক উপকার বয়ে আনে। যখন একজন মানুষ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসে, তখন সে কুরআনের জীবন্ত ব্যাখ্যা হয়ে ওঠে। আর নিকটে থাকলে মানুষ অনেক বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করে এবং প্রভূত জ্ঞান অর্জন করে।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯১ ,৯২)

## শিয়ারা দাবি করে যে খিলাফতের প্রকৃত অধিকার হযরত আলি (রা.)-এরই ছিল এবং এ বিষয়ে মহানবী (সা.) একটি ওসীয়্যত রেখে গিয়েছিলেন।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সুরা মোমেনের প্রারম্ভিক আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:
শিয়ারা দাবি করে যে খিলাফতের প্রকৃত অধিকার হযরত আলি (রা.)-এরই ছিল এবং এ বিষয়ে মহানবী (সা.) একটি ওসীয়্যত রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের ধারণা, হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.), যারা খিলাফত কামনা করতেন, তাঁরা হযরত আলীর অধিকার হরণ করে নিজেদের খলীফা ঘেষণা করেছিলেন। এই বিশ্বাস প্রথমত ভিত্তিহীন, কারণ এতে ধরে নেওয়া হয় যে- একজন সাহসী ও বীরপুরুষ হযরত আলী (রা.) যিনি খিলাফতকে নিজের অধিকার মনে করতেন এবং তাঁদের মতে নবীর ওসীয়্যতও তাঁর কাছে ছিল- তবুও তিনি নীরব থাকলেন, নবীর ওসীয়্যত উপেক্ষা করলেন এবং মুসলিম উম্মাহকে বিপথগামী হতে চেয়ে বসে রইলেন। এটি একেবারেই অযৌক্তিক ধারণা। তাছাড়া ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে হযরত আলী (রা.)বাস্তবেই হযরত আবু বকর (রা.)এর প্রতি বয়আত করেছিলেন, পরে হযরত উমর (রা.)-এর বয়আত করেন এবং তাঁদের সঙ্গে কাজ অব্যাহত রাখেন। বরং হযরত উমর (রা.) এর খিলাফতের সময় তাঁর সফরের সময়গুলোতে একাধিকবার হযরত আলী (রা.) মদিনার প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। যেমন, তাবারী বর্ণনা করেছেন যে সেতুর যুদ্ধে (ওয়াকিয়াতুল জিরস) মুসলমানরা পারস্য বাহিনীর কাছে পরাজিত হলে, হযরত উমর (রা.) পরামর্শক্রমে নিজেই সীমান্তে সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে হযরত আলীকে মদিনার গভর্ণর নিয়োগ করেন। আবার, মুসলমানরা যখন বায়তুল মুকাদ্দস অবরোধ করেছিল এবং সেখানকার অধিবাসীরা হযরত উমর (রা.) নিজে না আসা পর্যন্ত আত্মসমপর্ণ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তখনও তিনি কয়েক মাস মদিনার বাইরে অবস্থানকালে হযরত আলী (রা.) কে মনিদার প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। এসব ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে হযরত আলী (রা.)-এর মনে খিলাফত নিয়ে কোন ক্ষোভ ছিল না; বরং হযরত উমর (রা.) নিশ্চিন্ত মনে তাঁকে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন। অন্যথায় বলতে হবে -নাউযুবিল্লাহ্- হযরত আলী (রা.) সত্য গোপন করার অভ্যাস পোষণ করতেন। অথচ যদি এমন অভিযোগ কোন শিয়া আলেমের বিরুদ্ধে তোলা হয়, তবে তাঁরা তীব্র প্রতিবাদ করতেন; অথচ তাঁরা নির্দ্বিধায় হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে এমন অবমাননাকর অভিযোগ আরোপ করেন। প্রকৃতপক্ষে, এটি আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.)-এর অবমাননা নয়, বরং হযরত আলী (রা.)-এর অবমাননা।

( শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায়......)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

# জুমআর খুতবা

**মহানবী (সা.) তাঁর আঙুল মোবারক উঁচু করেন এবং বলেন,**
**মুহাম্মদ রসূলু ল্লাহ্ (সা.)-এর মর্যাদা এমন ছিল যে, যতই বিপদ হোক- আল্লাহ্ তাঁর দৃষ্টির আড়াল হতেন না, তেমনিভাবে তাঁর (সা.) তরবিয়তের প্রভাবেএই মর্যাদা নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে সাহাবীদের মাঝেও সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল।"**

**আর আল্লাহ্‌র শপথ! আমার পিতাও যদি সে সময় জীবিত থাকত এবং আমার সামনে এসে দাঁড়াত, তাহলে আমি আমার তরবারি তার বক্ষে বিদ্ধ করতাম অর্থাৎ গেঁথে দিতাম এবং সামান্যও দ্বিধা করতাম না।**

**মহানবী (সা.) তার জন্য দোয়া করে বলেন, 'আল্লাহুম্মা জিদহু সাবাতান' অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তাকে অধিক দৃঢ়তা প্রদান করো। নুযায়ের বলে, আল্লাহ্‌র শপথ! মহানবী (সা.)-এর দোয়ার কল্যাণে আমার হৃদয় দৃঢ়তার দিক থেকে পাথরসম হয়ে যায়। অতঃপর মহানবী (সা.) বলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র- যিনি তাকে সঠিক পথপ্রদর্শন করেছেন।**

**কয়েক মুহূর্তেই সেই দশ হাজার সাহাবীর সেনাবাহিনী যারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও মক্কার দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল, তাঁর (সা.) চতুর্দিকে একত্রিত হয়ে যায় এবং অল্প সময়েই পাহাড়ে উঠে তারা শত্রুদের ধ্বংস করে দেয় এবং এই বিপজ্জনক পরাজয় একটি মহান বিজয়ে রূপ নেয়।**

**যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মহানবী (সা.) যখন নিজ তাঁবুতে ফিরে আসেন তখন শায়বা বিন উসমান (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হন। মহানবী (সা.) তখন তাকে বলেন, হে শায়বা! তুমি সে সময় যা কিছু পরিকল্পনা করছিলে, তার চেয়ে এখন খোদা তা'লা তোমার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন- সেটি উত্তম।**

**হুনাইনের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট এবং আঁ হযরত (সা.)-এর জীবনচরিত।**

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, এর জুমআর খুতবা (৫ তবুক, ১৪০৪ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হুনাইনের যুদ্ধে শত্রুদের তিরন্দাজদের কারণে মুসলিম সেনাবাহিনীতে যে ভীতি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সূরা নূর-এর ৬৪ নম্বর আয়াতের তফসীরে এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন যে, নবীর আনুগত্য কীভাবে করা উচিত। আয়াতটি হলো:

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهٖٓ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ - (النور:64)

এর অনুবাদ হলো: হে মু'মিনরা! তোমরা একথা মনে কোরো না যে, রসূলের তোমাদের কাউকে ডাকা তোমাদের একে অপরকে ডাকার মতো। আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন যারা তোমাদের মধ্য থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে পরামর্শ সভা থেকে পালিয়ে যায়। অতএব যারা এই রসূলের আদেশের বিরোধিতা করে, তাদের ভয় করা উচিত যে, তাদের ওপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোনো বিপদ এসে না পড়ে অথবা তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপতিত না হয়।(সূরা নূর: ৬৪)

তিনি (রা.) বলেন, ইমামের আহ্বানের বিপরীতে সাধারণের ডাকের কোনো গুরুত্ব নেই। তোমাদের কর্তব্য হলো, যখনই তোমাদের কানে আল্লাহ্ তা'লার রসূলের ডাক আসবে, তোমরা তৎক্ষণাৎ তাতে লাব্বায়েক বলে সাড়া দেবে এবং তা পালনের জন্য দৌড়ে যাবে, কারণ এতেই তোমাদের উন্নতির রহস্য লুকিয়ে আছে। বরং যদি মানুষ সেই সময় নামাযরতও থাকে, তবুও তার কর্তব্য হলো- সে যেন নামায ভেঙে আল্লাহ্ তা'লার রসূলের আহ্বানে সাড়া দেয়। যাহোক, নবীর ডাকে তৎক্ষণাৎ লাব্বায়েক বলে সাড়া দেওয়া একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়, বরং (এটি) ঈমানের চিহ্নগুলোর মধ্য থেকে একটি বড়ো বিশেষ চিহ্ন। আর আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, হে মু'মিনরা! যদি কখনো আল্লাহ্ তা'লার রসূল তোমাদের ডাকেন, তাহলে তাঁর ডাককে অন্যদের ডাকের মতো মনে করো না, বরং তৎক্ষণাৎ তাঁর আওয়াজে লাব্বায়েক বলে সাড়া দেবে। অর্থাৎ, তিনি যেন বলে দিয়েছেন যে, মুহাম্মদ রসূলু ল্লাহ্ (সা.)-এর দুটি পৃথক পৃথক মর্যাদা রয়েছে- একটি পার্থিব অধিকর্তা হওয়ার দিক থেকে এবং একটি নবী হওয়ার দিক থেকে। পার্থিব নেতা হওয়ার দিক থেকেও তাঁর আদেশসমূহ মানা অত্যাবশ্যক, কিন্তু ধর্মীয় নেতা হওয়ার দিক থেকে তো তাঁর আহ্বানে লাব্বায়েক বলে সাড়া দেওয়া আরো বেশি অগ্রগণ্য। তিনি এখানে এর (তথা উক্ত আয়াতের) তফসীর বা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হুনাইনের যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করেন যে, ইতিহাস থেকে জানা যায়, হুনাইনের যুদ্ধের সময় যখন মক্কার কাফিররা ইসলামী সেনাবাহিনীতে এই বলে যোগদান করে যে, আজ আমরা আমাদের বীরত্বের ঝলক দেখা বো; অতঃপর বনু সাকীফের আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়- তখন এমন একটি সময় এসেছিল যখন মহানবী (সা.)-এর চারদিকে মাত্র বারোজন সাহাবী অবশিষ্ট ছিলেন। দশ হাজার সৈন্যের ইসলামী সেনাবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে যায়। আর কাফিরদের সেনাবাহিনী ছিল তিন হাজার তিরন্দাজ নিয়ে গঠিত; তারা তাঁর (সা.) ডানে-বামে পাহাড়ে উঠে তাঁর ওপর তির বর্ষণ করছিল। কিন্তু সেই সময়েও তিনি (সা.) পিছু হটতে চান নি, বরং এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর (সা.) বাহনের লাগাম ধরে ফেলেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার প্রাণ আপনার জন্য নিবেদিত! এখন এগিয়ে যাবার সময় নয়। এক্ষুনি ইসলামী সেনাবাহিনী একত্রিত হয়ে যাবে, তারপর আমরা এগিয়ে যাব। কিন্তু তিনি (সা.) অত্যন্ত প্রতাপের সাথে বলেন, আমার বাহনের লাগাম ছেড়ে দাও! অতঃপর (বাহনকে) গোড়ালি দিয়ে আঘাত করে এগিয়ে যেতে আরম্ভ করেন এবং বলতে থাকেন:

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ অর্থাৎ, আমি সেই প্রতিশ্রুত নবী যার সুরক্ষার চিরন্তন প্রতিশ্রুতি রয়েছে; আমি মিথ্যাবাদী নই। তাই তোমরা তিন হাজার তিরন্দাজ হও বা ত্রিশ হাজার, আমি তোমাদের কোনো পরোয়া করি না। আর হে মুশরিকরা! আমার এই বীরত্ব দেখে আবার তোমরা আমাকে খোদা মনে কোরো না। আমি একজন মানুষ এবং তোমাদের সর্দার আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র, অর্থাৎ নাতি।

তাঁর চাচা হযরত আব্বাসের গলার স্বর অনেক উঁচু ছিল। তিনি (সা.) তার দিকে তাকিয়ে বলেন, হে আব্বাস! এগিয়ে এসো এবং ডাক দাও আর উচ্চৈঃস্বরে ডাকো- হে সূরা বাকারার সাহাবীগণ! [অর্থাৎ যারা সূরা বাকারা

মুখস্থ করেছে।] হে হুদাইবিয়ার দিন গাছের নীচে বয়আত গ্রহণকারীগণ! আল্লাহ্র রসুল তোমাদের ডাকছেন। একজন সাহাবী বলেন, মক্কার নবদীক্ষিত মুসলমানদের কাপুরুষতার কারণে যখন ইসলামী সেনাবাহিনীর অগ্রভাগ পেছনের দিকে পালায়, তখন আমাদের বাহনগুলোও দৌড়াতে শুরু করে এবং আমরা যত বাধা দিতাম, তত বেশি সেগুলো পেছনের দিকে পালাতে থাকে। এমন সময় আব্বাসের আওয়াজ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে- হে সুরা বাকারার সাহাবীগণ! [এখানে বিশেষভাবে সুরা বাকারার নাম নিয়ে এজন্য ডাকা হয়েছিল, কারণ এটিই ছিল মদীনায় অবতীর্ণ সর্ব প্রথম সুরা এবং এই সুরায় এ আয়াতগুলোও রয়েছে যে, স্বল্প কিছু লোক অধিক লোকের ওপর আল্লাহ্র আদেশে বিজয়ী হয়, আর এতে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পূরণ করারও শিক্ষা রয়েছে।] হে হুদাইবিয়ার দিন গাছের নীচে বয়আত গ্রহণকারীগণ! আল্লাহ্র রসুল তোমাদের ডাকছেন। এই আওয়াজ যখন আমার কানে পৌঁছে, তখন আমার মনে হলো যেন আমি জীবিত নই, বরং মৃত। আর ইসরাফীলের শিঙা আকাশে ধ্বনিত হচ্ছে। আমি আমার উটের লাগাম জোরে টেনে ধরি এবং এর মাথা পিঠের সাথে লেগে যায়, কিন্তু সেটি এতটাই ভীত হয়ে পড়েছিল যে, আমি লাগামে ঢিল দিতেই সেটি আবার পেছনের দিকে দৌড়াতে থাকে। এতে আমি এবং আমার অনেক সাথি তরবারি বের করে নিই, আর অনেকেই উট থেকে লাফিয়ে পড়ে এবং অনেকে উটের গলা কেটে দেয় আর মহানবী (সা.)-এর দিকে দৌড়ে যেতে থাকে। আর কয়েক মুহূর্তেই সেই দশ হাজার সাহাবীর সেনাবাহিনী যারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও মক্কার দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল, তাঁর (সা.) চতুর্দিকে একত্রিত হয়ে যায় এবং অল্প সময়েই পাহাড়ে উঠে তারা শত্রুদের ধ্বংস করে দেয় এবং এই বিপজ্জনক পরাজয় একটি মহান বিজয়ে রূপ নেয়।"

(তফসীরে কবীর, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৬২৪-৩২৬) (সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৫)

অনুরূপভাবে তাঁর (রা.) 'উসওয়ায়ে হাসানা' শীর্ষ ক একটি বক্তৃতায়ও হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনার উল্লেখ করেন যে, মক্কা বিজয়ের পর যখন মহানবী (সা.) কিছু আরব গোত্রের মোকাবিলার জন্য হুনাইনের যুদ্ধে গমন করেন, তখন যেহেতু মক্কায় অনেক লোক সবেমাত্র মুসলমান হয়েছিল, সেজন্য তারাও মহানবী (সা.)-এর সাথে যোগ দিয়েছিল। আর যারা তখনো মুসলমান হয় নি, তারাও শুধু মাত্র জাঁকজমক প্রদর্শন ও জাতীয় উদ্দীপনার কারণে মুসলমানদের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। আর তারা তাদের সংখ্যাধিক্য ও শক্তি নিয়ে অহংকার শুরু করে দেয় এবং বলতে থাকে, আমাদের সংখ্যা আজ অ নেক, আজ আমাদের কেউ পরাজিত করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'লা তাদের এই অহংকারের শাস্তি দেওয়ার জন্য এমন ব্যবস্থা করেন যে, মুসলমানদের সেনাবাহিনী যখন অগ্রসর হয় তখন শত্রুরা গোপন স্থানে লুকিয়ে পড়ে এবং তাদের বড়ো বড়ো দক্ষ তিরন্দাজদের কিছু ডান পাশে লুকিয়ে বসে থাকে এবং কিছু বাম পাশে লুকিয়ে বসে থাকে। সেনাবাহিনী যখন সেই স্থান দিয়ে অতিক্রম করে যার ডানে-বামে হাজার হাজার তিরন্দাজ লুকিয়ে বসে ছিল, তখন তারা আচমকা ইসলামী সেনাবাহিনীর ওপর বৃষ্টির মতো তির ছোড়ে। এটা দেখে সেই 'হাদীসুল আহাদ' অর্থাৎ নবীন ও নতুন মুসলমানরা- যাদের মধ্যে এখনও দুর্বলতা রয়ে গিয়েছিল, এবং মক্কার সেই কাফিররা- যারা শুধু জাতীয় উদ্দীপনার কারণে মুসলমানদের সাথে যোগ দিয়েছিল- তারা দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়। এমতাবস্থায় যখন প্রথম সারির লোকেরা পালিয়ে যায়, তখন আবশ্যিকভাবে পেছনে আগমনকারীদের ঘোড়াও ভড়কে যায় এবং সেগুলোও পালাতে শুরু করে। এই যুদ্ধেও এমনটাই ঘটেছে। যখন সেসব অনভিজ্ঞ মুসলমান এবং কাফির তিরের বৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে যায়, তখন সাহাবীদের ঘোড়া ও উটগুলোও পালাতে আরম্ভ করে। আর পুরো ইসলামী সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এই বিপদ এমন সীমায় পৌঁছায় যে, রসুলু ল্লাহ্ (সা.)-এর আশেপাশে শুধু বারোজন অবশিষ্ট রয়ে যায়, অন্য সবাই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়। এটি দেখে হযরত আব্বাস (রা.) রসুলু ল্লাহ্ (সা.)-এর ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেলেন এবং নিবেদন করেন, এখন কালক্ষেপণের সুযোগ নেই; ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ফেলুন এবং ফেরত চলুন, যেন ইসলামী সেনাবাহিনীকে পুনরায় একত্রিত করে আক্রমণ করা যায়। কিন্তু রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, খোদার নবী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে না। এটি বলে তিনি ঘোড়ার লাগাম ধরেন এবং সেটিকে হাঁকিয়ে আরো এগিয়ে নিয়ে যান এবং বলেন,

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ
أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

অর্থাৎ, আমি খোদার নবী, মিথ্যাবাদী নই। আমি আজ যে এসব তিরন্দাজকে কারণে ভয় পাই নি এবং চার হাজার তিরন্দাজ দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়া সত্ত্বেও সামনের দিকেই অগ্রসর হচ্ছি-এই দৃশ্য দেখে কেউ এটি মনে করো না যে, আমি খোদা অথবা আমার মাঝে ঐশ্বরিক গুণাবলি বিদ্যমান। স্মরণ রেখো! আমি খোদা নই। আমি সেই আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র। কিন্তু এই লোকেরা খোদার প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকেন। [অর্থাৎ, নবী, রসুল ও আল্লাহ্র ওলী যারা হন-তারা খোদার প্রতিচ্ছবি হন, খোদাকে প্রদর্শনকারী হন।] যখন এই অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং শত্রুরা আনন্দিত হয় যে, তারা মুসলমানদের মেরে ফেলেছে- তখন রসুলু ল্লাহ্ (সা.) হযরত আব্বাসকে (রা.) সম্বোধন করে বলেন, আব্বাস! ডাক দাও- হে আনসার! আল্লাহ্র রসুল তোমাদের ডাকছেন। যখন হযরত আব্বাস (রা.) উচ্চৈঃস্বরে রসুলু ল্লাহ্ (সা.)-এর এই বাক্যটি পুনরাবৃত্তি করেন, হে আনসার! আল্লাহ্র রসুল তোমাদের ডাকছেন- তখনকার কথা একজন আনসার এভাবে বর্ণনা করেন: সে সময় অবস্থা এমন ছিল যে, আমাদের ঘোড়া ও উট আমাদের কব্জা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল আর মনে হচ্ছিল, যেন মক্কা বা মদীনায় না পৌঁছানো পর্যন্ত এগুলো থামবে না। সেগুলো মক্কার হাজার হাজার লোকের পালানোর কারণে এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে, কোনোভাবেই ফেরত আসছিল না। আমরা আমাদের বাহনগুলোর লাগাম ধরে টানছিলাম এবং এত শক্তি প্রয়োগ করছিলাম যে, সেগুলোর মুখ সেগুলোর লেজকে স্পর্শ করছিল; কিন্তু ফেরত আসার পরিবর্তে সেগুলো পেছনের দিকেই ছুটছিল। আমাদের অবস্থা এমন ছিল যে, আমাদের কানে হযরত আব্বাসের (রা.) এই আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, হে আনসার! আল্লাহ্র রসুল তোমাদের ডাকছেন। তিনি বলেন, এই আওয়াজ শুনতেই আমাদের অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, আমাদের মনে হচ্ছিল না- কোনো মানুষ আমাদেরকে ডাকছেন; বরং আমাদের মনে হচ্ছিল যেন তা কিয়ামতের দিন, এবং মৃত রূহগুলোকে জীবিত করার জন্য ইসরাফীলের শিঙায় ফুঁ দেওয়া হচ্ছে। সে সময় পৃথিবী ও পৃথিবীর মাঝে যা কিছু আছে সেসবের কোনো জ্ঞান আমাদের ছিল না। শুধু একটি আওয়াজই আমাদের কানে বাজছিল, আর সেটি ছিল আব্বাসের আওয়াজ। সে সময় আমাদের সব দুর্বলতা দূর হয়ে যায় এবং হয় আমাদের মাঝে এই অনুভূতি কাজ করছিল যে, আমরা আমাদের ঘোড়া ও উটগুলোকে থামাতে পারছি না, অথবা আমরা শেষবারের মতোআরেকবার জোর খাটালাম এবং নিজেদের ঘোড়া ও উটগুলোকে পেছন ফেরানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করলাম। যেগুলো ফিরল সেগুলো তো ফিরলই; আর যেগুলো ফিরল না- আমরা তরবারি বের করে সেগুলোর গলা কাটলাম এবং পায়ে দৌড়েই রসুলু ল্লাহ্ (সা.)-এর কাছেপৌঁছে গেলাম। এরা ছিলেন সেসব লোক যারা মুহাম্মদ রসুলু ল্লাহ্ (সা.)-এর ঈমান দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। যেভাবে মুহাম্মদ রসুলু ল্লাহ্ (সা.)-এর মর্যাদা এমন ছিল যে, যতই বিপদ হোক- আল্লাহ্ তাঁর দৃষ্টির আড়াল হতেন না, তেমনিভাবে তাঁর (সা.) তরবিয়তের প্রভাবেএই মর্যাদা নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে সাহাবীদের মাঝেও সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল।"

(উসওয়ায়ে হাসানা, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৭, পৃ: ৯৩-৯৫)

মহানবী (সা.)-এর সাথে কারা অবিচল ছিলেন- সে সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আমি হুনাইনের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম। মুসলমানরা পালিয়ে যায় আর তাঁর (সা.) সাথে মুহাজির ও আনসারের মধ্য থেকে কেবল আশিজন অবশিষ্ট থাকেন। আমরা অবিচল ছিলাম আর আমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করি নি, এবং এরাই তারা যাদের ওপর আল্লাহ্ তা'লা প্রশান্তি নাযিল করেন। মহানবী (সা.) তাঁর খচ্চরের ওপরেই ছিলেন এবং এক পা-ও পিছু হটেন নি। তাঁর (সা.) খচ্চরটি সামান্য ঝুঁকলে তিনি (সা.) জিন থেকে নীচে হেলে পড়েন। আমি বলি, আপনি সোজা হয়ে বসুন; আল্লাহ্ আপনার মর্যাদাকে সমুন্নত রাখুন। তিনি (সা.) বলেন, আমাকে এক মুঠো মাটি দাও। আমি মহানবী (সা.)-কে মুঠো ভরে মাটি দিলাম। এরপর তিনি (সা.) আমার কাছ থেকে সেই এক মুঠো মাটি নিয়ে শত্রুদের মুখ বরাবর নিক্ষেপ করলে তাদের চোখমুখ মাটি দিয়ে ভরে যায়। অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, মুহাজিরীন ও আনসার কোথায়? আমি বলি, তারা এখানেই আছেন। তিনি (সা.) বলেন, তাদেরকে ডাকো। আমি তাদেরকে ডাকলাম। তারা (রা.) ডান হাতে নিজেদের তরবারি নিয়ে আসেন এবং মুশরিকরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে যায়।

## মহানবী (সা.)-এর বাণী

**অতিথিকে গৃহের দরজা পর্যন্ত গিয়ে বিদায় জানানোও সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত।** (সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Azima Khatun,
From- Mirza Enayetulla Sb Harhari, Murshidabad

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, লোকজন যখন পালিয়ে যায়, অর্থাৎ মুসলিম সেনাবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে, তখন মহানবী (সা.)-এর সাথে পাশে প্রায় একশজন অবশিষ্ট ছিলেন। তখন তিনি (সা.) দোয়া করেন, اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَاِلَيْكَ الْمُشْتَكٰى وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। আমরা তোমার কাছেই অভিযোগ করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেন, আপনার ওপর সেই বাক্যাবলিই অবতীর্ণ হয়েছে যা হযরত মুসা (আ.)-কে সমুদ্র বিদীর্ণ হওয়ার দিন শেখানো হয়েছিল।

(সূত্র: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩২৫-৩২৭)

হযরত হারসা বিন নুমান (রা.) বর্ণনা করেন, লোকজন যখন পিছু হটে তখন আমি অনুমান করি, মহানবী (সা.)-এর সাথে কেবল একশজন রয়েছেন।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, সেই দিন অর্থাৎ হুনাইনের যুদ্ধের দিন তাঁর (সা.) সাথে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.) ছিলেন। তাঁরা সবাই দশটির অধিক করে আঘাত করেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-ও তাঁদের মাঝে ছিলেন। আর আনসারের মাঝ থেকে হযরত আবু দুজানা, হারেসা বিন নুমান (রা.), সা'দ বিন উবাদা (রা.), আবু বশীর (রা.), উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.) এবং মক্কাবাসীদের মাঝ থেকে শায়বা বিন উসমান (রা.) অবিচল ছিলেন।

মহিলাদের মাঝে হযরত উম্মে সুলায়েম বিনতে মিলহান, উম্মে আম্মারা নুসীবা বিনতে কা'ব, উম্মে হারেস, উম্মে সুলায়েত বিনতে উবায়দ (রা.)-ও রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন।

(সূত্র: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩২৯-৩৩০)

মহিলা সাহাবীদের অবিচলতা প্রসঙ্গে রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হযরত উম্মে সুলায়েম বিনতে মিলহান (রা.)-কে দেখেন, তিনি (রা.) তার স্বামী আবু তালহা (রা.)-র সাথে ছিলেন আর তিনি ছিলেন সন্তানসম্ভবা। তার আশঙ্কা ছিল, উট আবার তাদেরকে নীচে না ফেলে দেয়। তাই তিনি তার হাত উটের নাকে বাঁধা রশি ও লাগামের মাঝে রেখে উটের মাথা নিজের কাছে টেনে রাখেন। মহানবী (সা.) বলেন, উম্মে সুলায়েম নাকি? জবাবে তিনি (রা.) বলেন, জি, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত! সেই ভদ্রমহিলার কাছে একটি খঞ্জর ছিল। হযরত আবু তালহা (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! ইনি উম্মে সুলায়েম (রা.),তার কাছে খঞ্জর রয়েছে। মহানবী (সা.) তাকে বলেন, এই খঞ্জর কী উদ্দেশ্যে? জবাবে উম্মে সুলায়েম (রা.) বলেন, আমি এজন্য এটি রেখেছি- যদি মুশরিকদের মধ্য থেকে কেউ আমার কাছে আসে তবে আমি তার পেট চিরে ফেলব। একথা শুনে মহানবী (সা.) মৃদু হাসেন। এমন বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতেও হযরত উম্মে সুলায়েম (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। মহানবী (সা.)-কে একলা ফেলে লোকদের এভাবে পলায়নের ফলে তার (রা.) মনে এত গভীর বেদনা ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল যে, তিনি মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার আতিশয্যে তাঁর (সা.) কাছে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! আমাদের পরে যেসব 'তুলাকা' অর্থাৎ মুক্তিপ্রাপ্ত লোকেরা যোগ দিয়েছে; 'তুলাকা' হচ্ছে মক্কার সেসব অধিবাসী যাদেরকে মহানবী (সা.) لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اِذْهَبُوْا اَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ বলে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, আর যাদের মধ্য দুই হাজার হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং শত্রুদের অনবরত তির নিক্ষেপের কারণে পলায়ন করেছিল এবং পুরনো সাহাবীদেরকেও পিছু হটতে বাধ্য করেছিল-এতে তাদের উল্লেখ রয়েছে। যাহোক, তিনি বলেন, যারা আপনার (সা.) সাথে থাকা সত্ত্বেও পরাজিত হয়েছে- তাদেরকে, অর্থাৎ সেসব তুলাকাকে হত্যা করুন। মহানবী (সা.) বলেন, হে উম্মে সুলায়েম! নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা শত্রুদের মোকাবিলায় যথেষ্ট হয়েছেন এবং তিনি অনুগ্রহ করেছেন।

আরেকজন বীরাঙ্গনা সাহাবীয়া হযরত আম্মারা (রা.) বর্ণনা করেন, হুনাইনের যুদ্ধের দিন যখন লোকেরা পলায়ন করেছিল তখন আমরা চারজন নারী (যুদ্ধক্ষেত্রে) উপস্থিত ছিলাম। আমার কাছে অত্যন্ত ধারালো তরবারি ছিল এবং উম্মে সুলায়েমের কাছে ছিল খঞ্জর। আর তিনি সেই খঞ্জরটি তার কোমরে বেঁধে রেখেছিলেন এবং তিনি সন্তানসম্ভবা ছিলেন। এছাড়াও হযরত উম্মে সুলায়েত (রা.) এবং উম্মে হারেসও (রা.) সেখানে ছিলেন। একটি বর্ণনানুযায়ী হযরত উম্মে আম্মারা (রা.) উঁচু আওয়াজে বলতে আরম্ভ করেন, হে আনসার! পলায়নের সাথে তোমাদের কী সম্পর্ক? তিনি বলেন, আমি হাওয়াযিনের এক ব্যক্তিকে দেখলাম, যে পতাকা উঁচিয়ে গোধূম বর্ণের উটে আরোহিত অবস্থায় ছিল। সে মুসলমানদের পিছু পিছু যাচ্ছিল। আমি তার সামনে এসে তার উটের পায়ের রগে আঘাত করি। তখন সেই আরোহী ব্যক্তি চিত হয়ে পড়ে যায়। এরপর আমি তার ওপর আক্রমণ করি এবং তার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তরবারি দ্বারা উপর্যুপরি আঘাত করতে থাকি। এরপর আমি তার তরবারি নিয়ে নিই। মহানবী (সা.) তাঁর তরবারি উঁচিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি যখন সেখানে পোঁছাই তখন তিনি (সা.) উচ্চকণ্ঠে বলছিলেন, হে সূরা বাকারার সাথিরা! তখনই আনসার আক্রমণ করতে করতে ফেরত আসেন। আর হাওয়াযিনের লোকেরা সাহাবীদের সামনে ততক্ষণই টিকতে পেরেছিল যতটুকু সময় উটনীর দুধ দোহন করতে লাগে। অর্থাৎ,তারা খুব স্বল্প সময় মোকাবিলা করতে পেরেছিল। এরপর শত্রুরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। তিনি বলেন, আমি শত্রুদের এরকম লাঞ্ছনাদায়ক পরাজয় কখনো দেখি নি। তারা যে যেদিকে পারে পালিয়ে যাচ্ছিল। আমার ছেলে হুবাইব এবং আব্দুল্লাহ্ আমার নিকট ফেরত আসে আর তাদের কাছে যুদ্ধবন্দি ছিল।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৩০-৩৩১) (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সাইর হাদীস-৩৩৬০) (সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৩৯)(কিতাবুল মাগাযি, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১৬)

হযরত আবু বশীর মাযীনী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হুনাইনের যুদ্ধের দিন আমরা ভোরের (অর্থাৎ ফজরের) নামায পড়ি। অতঃপর আমরা সেই স্থানে পোঁছি যেখানে মহানবী (সা.) আমাদেরকে দাঁড় করান। আমাদের কোনো ধারণাই ছিল না- (কী ঘটতে যাচ্ছে।) সূর্যোদয়ের কাছাকাছি সময় হঠাৎ আমাদের ওপর আক্রমণ হয়। আমাদের সৈন্যদলের অগ্রভাগ আমাদের পানে প্রত্যাবর্তন করে যারা পরাজিত হয়েছিল। আমাদের সৈন্য সারিগুলো এলোমেলো হয়ে যায় এবং আমরা সৈন্যদের সম্মুখভাগসহ পরাজিত হয়ে যাই। আমি প্রত্যাবর্তন করে সামনে অগ্রসর হই, কেননা আমি যুবক ছিলাম। যখন আমি জানতে পারলাম, মহানবী (সা.) সৈন্যবাহিনীর সম্মুখভাগে রয়েছেন, তখন আমি বলতে থাকি, হে আনসার! আমার পিতামাতা মহানবী (সা.)-এর জন্য উৎসর্গিত! তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছো?[এভাবে তিনি তাদেরকে ডাকেন।] আমি পরাজিত লোকদেরকে পুনরায় ফেরত পাঠাচ্ছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল কেবল মহানবী (সা.)-কে নিরাপদ অবস্থায় দেখা। এমনকি আমি মহানবী (সা.)-এর নিকট পোঁছে যাই। তখন তিনি (সা.) বলছিলেন, হে আনসার! হে আনসার! আমি তাঁর (সা.) বাহনের নিকট যাই। পেছন ফিরে আমি দেখতে পাই, আনসার সাহাবীরাতৎক্ষণাৎ ফেরত আসছিলেন আর মহানবী (সা.) নিজ বাহনে আরোহিত অবস্থায় শত্রুদের মুখোমুখি দণ্ডায়মান ছিলেন। তখন আনসার সাহাবীগণ মহানবী (সা.) -এর সম্মুখে যুদ্ধ করতে থাকেন এবং তারা মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। এরপর আনসার সাহাবীগণ শত্রুদের পিছু হটতে বাধ্য করেন, এমনকি আমরা তাদেরকে এক ফারসাখ অর্থাৎ তিন মাইল পর্যন্ত পিছু হটালাম। তারা গিরিপথে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং আমাদের কাছে পরাজিত হয়। অতঃপর মহানবী (সা.) তাঁর বাসস্থানে অর্থাৎ তাঁবুর দিকে ফিরে যান এবং বন্দিরা তাঁর (সা.) আশপাশে বাঁধা অবস্থায় রাখা ছিল। একটি দল তাঁর (সা.) তাঁবুর পাশে ছিল। মহানবী (সা.)-এর সাথে তাঁর দুইজন সহধর্মিণী হযরত উম্মে সালামা (রা.) এবং হযরত যয়নব (রা.) ছিলেন। অন্য এক বর্ণনায় হযরত উম্মে সালামা (রা.) এবং হযরত মায়মুনা (রা.)-র উল্লেখ পাওয়া যায়। তাদের আশেপাশে সেই দলটি ছিল যারা মহানবী (সা.)-কে পাহারা দিচ্ছিলেন।আর তারা হলেন আব্বাদ বিন বিশর (রা.), আবু নায়লা (রা.) এবং মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)।

ইবনে উকবা (রা.) বর্ণনা করেন, কুরাইশের এক ব্যক্তি সাফওয়ান বিন উমাইয়ার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে তখনও মুশরিক ছিল আর হুনাইনের যুদ্ধের দৃশ্য দেখার জন্য এসেছিল। সেই (কুরাইশ) ব্যক্তি বলে, তোমার জন্য সুসংবাদ! মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা পরাজিত হয়েছেন।

## যুগ খলীফার বাণী

**কঠিন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একটিই পথ- আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নতজানু হও।** (খুতবা, জুমআ, ১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Late Shohrae Alam & Alia Bibi
From-Mahmood Alam Sb. Barisha, 24 PGS (s)

## যুগ ইমামের বাণী

**জ্ঞান বলতে যুক্তি কিম্বা দর্শনশাস্ত্রকে বোঝানো হয় না, বরং প্রকৃত জ্ঞান সেটাই যা আল্লাহ তা'লা (মানুষকে) কেবল নিজ কৃপাগুণে দান করেন।**

**(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৫)**

দোয়াপ্রার্থী: Late Haji Ansar
From-Rezuwan Islam Mandal. Bithari, 24 PGS (N)

[শুরুতে যে আক্রমণ হয়েছিল– সেটির প্রেক্ষিতে সে এই পরাজয়ের সংবাদ দেয়।] এরপর সেই মুশরিক বলে, আল্লাহ্‌র শপথ! এখন তারা আর কখনো পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসতে পারবে না, অর্থাৎ তাদের এখন আর বিজয় লাভ হবে না। তখন সাফওয়ান বলে, তুমি আমাকে বেদু ইনদের বিজয়ের সুসংবাদ দিচ্ছো! আল্লাহ্‌র শপথ! বেদু ইনদের সর্দার হবার চেয়ে কোনো কুরাইশের সর্দার হওয়া আমার কাছে অধিক প্রিয়। শত্রুদের (বিজয়ের) কথা শুনে সাফওয়ান ক্রোধান্বিত হয়। সে তার এক দাসকে খবর নেবার জন্য প্রেরণ করে বলে, মনোযোগ দিয়ে শোনো তো– কাদের সংকেত ধ্বনি ভেসে আসছে?কেননা ততক্ষণে স্লোগানের ধ্বনিও আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। সে তার কাছে ফিরে এসে বলে, আমি তাদেরকে এ কথা বলতে শুনেছি, হে বনু আব্দুর রহমান! হে বনু উবায়দুল্লাহ্! হে বনু আব্দুল্লাহ্! সে বলে, মুহাম্মদ (সা.) বিজয় লাভ করেছেন; এটি তাদের যুদ্ধের সংকেত। এতে সাফওয়ান প্রশান্তি লাভ করে বলে, মুহাম্মদ (সা.) বিজয় লাভ করেছেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩১৮-৩২০) [দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৬০]

এ যুদ্ধে কাফিরদের প্রতি মহানবী (সা.)-এর কঙ্কর নিক্ষেপ এবং দোয়া করার ব্যাপারে এভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়, যেভাবে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন–আমাকে মাটি দাও, (আমি তা) নিক্ষেপ করব। এর বিশদ বিবরণ একস্থানে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবীদের প্র ত্যাবর্তনের পর যখন প্র চণ্ড যুদ্ধ হচ্ছিল তখন মহানবী (সা.) যুদ্ধের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন আর তখন তিনি (সা.) নিজ খচ্চরের ওপর আরোহিত অবস্থায় ছিলেন। মহানবী (সা.) বলেন, প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছে ! বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.) একমুঠোকঙ্কর নিয়ে সেগুলো কাফিরদের মুখ লক্ষ করে নিক্ষেপ করেন। এরপর বলেন, মুহাম্মদের প্রভুর শপথ! আরেকটি বর্ণনায় আছে, মহানবী (সা.) বলেন, কা'বার প্রভুর শপথ! এই লোকেরা পরাজিত হয়েছে।

হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, আমি দেখতে পেলাম, যুদ্ধ ঠিকসেভাবেই চলছিল যেমনটি আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি দেখলাম, মহানবী (সা.)-এর কঙ্কর নিক্ষেপ করামাত্র তাদের (আক্রমণের) তীব্রতা হ্রাস পেতে আরম্ভ করল; অর্থাৎ শত্রুর আক্রমণের তীব্রতা কমতে থাকে আর তাদের বিষয়টি উলটে যেতে থাকে, অর্থাৎ শত্রুরা পরাজয়ের দিকে ধাবিত হয়।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সাইর, হাদীস-১৭৭৫)

এর বিশদ বিবরণ এভাবে পাওয়া যায়, মহানবী (সা.) নিজের খচ্চরের ওপর আরোহিত অবস্থায় উভয় রেকাবের ওপর পা রেখে দাঁড়িয়ে যান। এরপর তিনি (সা.) দুহাত তুলে এই দোয়া করেন, اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ مَا وَعَدْتَنِي اَللّٰهُمَّ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَظْهَرُوا عَلَيْنَا অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি তোমাকে সেই প্রতিশ্রুতির দোহাই দিচ্ছি যা তুমি আমার সাথে করেছিলে। হে আল্লাহ্! এটি তাদের জন্য সমীচীন হবে না যে, তারা আমাদের ওপর বিজয় লাভ করবে আর আমরা পরাজিত হবো।

ইয়াযীদ বিন আমর সুওয়াঈ বর্ণনা করেন; তিনি হুনাইনের যুদ্ধে মুশরিকদের সাথে ছিলেন এবং পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হুনাইনের যুদ্ধের দিন ভূপৃষ্ঠ থেকে এক মুঠো মাটি নিয়ে মুশরিকদের দিকে তাকান এবংতাদের চেহারা লক্ষ করে তা নিক্ষেপ করেন। আর তিনি (সা.) বলেন, তোমরা ফিরে যাও,তোমাদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেছে। (তাদের) যে ব্যক্তিই নিজের ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎকরছিল সে নিজের চোখে কিছু বিদ্ধ হওয়ার অনুযোগ করছিল আর নিজের চোখ রগড়াচ্ছিল।অর্থাৎ শত্রুদের চোখে জ্বালা শুরু হয়। সেসময় মহানবী (সা.) দু লদু ল নামক খচ্চরে আরোহিত ছিলেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩২২,৩২৪) (আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৪)

শায়বা বিন উসমান কুরাইশের একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিল। তার পিতা উসমান বিন তালহা উহুদের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। এ ব্যক্তি মক্কা থেকে হুনাইনের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেয়। কারো কারো মতে, মক্কা বিজয়ের সময় এ ব্যক্তি মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। সে নিজে বর্ণ না করে, আমি এই সংকল্প নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম যে, যখনই সুযোগ পাবো– আমার পিতার হত্যার প্রতিশোধস্বরূপ মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করে নিজের হৃদয়কে প্রশান্ত করব, নাউযুবিল্লাহ্। [এর অর্থ হলো, সে মুসলমান হয় নি।] ইসলামের সাথে বিরোধিতার এমন চিত্র ছিল যে, এ ব্যক্তি বলত, সমগ্র আরব ও অনারব বিশ্বও যদি মুহাম্মদ (সা.)-এর কলেমা পাঠ করে তবুও আমি তাঁর অনুসরণ করব না। যাহোক, শায়বা যখন দেখল, মুসলমানরা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করেছে এবং মুহাম্মদ (সা.) কেবল গুটিকতক লোকের মাঝে রয়েছেন; সে বর্ণনা করে, তখন আমি ভাবি, এখনই আমার জন্য উপযুক্ত সময়, তাঁকে হত্যা করতে পারব (নাউযুবিল্লাহ্)। সে বলে, আমি তাঁর ডান দিক থেকে আক্রমণ করার জন্য সামনে অগ্রসর হলে সেখানে তাঁর চাচা আব্বাসকে দাঁড়ানো দেখতে পাই। তখন আমি চিন্তা করি, আব্বাসের উপস্থিতিতে মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং আমি ঘুরে যাই এবং তাঁর বাম দিক থেকে আক্রমণ করার সংকল্প করি। তখন সেখানে দেখলাম, আবু সুফিয়ান বিন হারেস দাঁড়িয়ে আছে। তারপর সেখান থেকেও ফেরত আসি এবং তাঁর পেছন দিক থেকে আক্রমণ করার সংকল্প করি। অতঃপর যখন আক্রমণ করার অভিপ্রায়ে সামনে অগ্রসর হই তখন চোখে হাত দিয়ে উলটো পায়ে দ্রুত পলায়ন করি। পরবর্তীতে সে বর্ণনা করত, ঠিক সে মুহূর্তে আমি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্গিরিত হতে দেখি; এমন মনে হয় যে, সেই স্ফুলিঙ্গ আমাকে ভস্ম করে দেবে। এরই মাঝেমহানবী (সা.) ডেকে বলেন, শায়বা! আমার কাছে আসো। তিনি (সা.) টের পেয়ে গিয়েছিলেন যে, এ ব্যক্তি পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর নিকটেগেলাম।

তিনি (সা.) মৃদু হাসলেন এবং আমার বুকে তাঁর পবিত্র হাত বুলিয়ে দিলেন আর দোয়া করলেন, اَللّٰهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُ الشَّيْطَانَ অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি শয়তানকে এর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দাও। শায়বা বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! সাথে সাথেই মহানবী (সা.) আমার নিকট আমার কান, চোখ এবং আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় হয়ে গেলেন আর আমার হৃদয় পরিষ্কার হয়ে গেল।

মহানবী (সা.) শায়বাকে বলেন, হে শায়বা! কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। তিনি বর্ণনা করেন, এখন আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতিরক্ষার জন্য শত্রুদের দিকে তরবারি নিয়ে অগ্রসর হই এবং মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসায় এমনভাবে যুদ্ধ করতে থাকি যে, তখন যদি আমার পিতাও আমার সামনে আসত তবে তাকেও আমি হত্যা করতাম।

[দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৬০]

৫৬-২৫৮] (গাযওয়াতুন নবী, প্রণেতা-আল্লামা আলি বুরহান হালবি, পৃ: ৬৩৯)

এই ঘটনাটি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও নিজের মতো করে বর্ণনা করে বলেন,মহানবী (সা.) সম্বন্ধে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, এক ব্যক্তি বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল; কিন্তু তার অভিপ্রায় ছিল, (উভয়)সৈন্যবাহিনী যখন পরস্পর মুখোমুখি হবে তখন আমি সুযোগ বুঝে রসুলে করীম (সা.)-কে শহীদ করব। যুদ্ধ যখন প্রবলভাবে চলছিল তখন সে ব্যক্তি তরবারি বের করে। মহানবী (সা.) সে সময় একা ছিলেন, সাথে কেবল হযরত আব্বাস ছিলেন। সেই ব্যক্তি এটিকে মোক্ষম সুযোগ মনে করে সামনে অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করতে চায়। আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে ইলহামের মাধ্যমে জানিয়ে দেন, এ ব্যক্তির হৃদয়ে কপটতা আছে , অর্থাৎ শত্রুতা রয়েছে। সেই ব্যক্তি স্বয়ং বলে, আমি তাঁর (সা.) দিকে অগ্রসর হই এবং আমার ধারণা ছিল, এখন আমার তরবারি তঁা র (সা.) শিরশ্ছেদ করবে। কিন্তু আমি যখন তাঁর নিকটবর্তী হই তখন তিনি (সা.) নিজের হাত আমার দিকে বাড়ান এবং বুকের ওপর রেখে বলেন, হে আল্লাহ্! তুমি একে শয়তানী চিন্তাভাবনা থেকে পরিত্রাণ দাও এবং তার বিদ্বেষ দূর করে দাও। সেই ব্যক্তি বলে, তৎক্ষণাৎ আমার এমন মনে হলো, তাঁর (সা.) মতো প্রিয় আর কোনোকিছু নেই। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, সামনে অগ্রসর হও এবং যুদ্ধ করো। অতঃপর আমি তরবারি উঁ চিয়ে ধরি। আর আল্লাহ্‌র শপথ! আমার পিতাও যদি সে সময় জীবিত থাকত এবং আমার সামনে এসে দাঁড়াত, তাহলে আমি আমার তরবারি তার বক্ষে বিদ্ধ করতাম অর্থাৎ গেঁথে দিতাম এবং সামান্যও দ্বিধা করতাম না। এই ভালোবাসাই তার শত্রুতা দূর করে দেয়। (আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২২, পৃ: ১১৪) অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসা তার শত্রুতাকে মুছে দেয়।

## মহান আল্লাহ্‌র বাণী

*তুমি বল,'হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্! তুমি যাহাকে চাহ রাজত্ব দান কর এবং যাহার নিকট হইতে চাহ রাজত্ব কাড়িয়া লও।*

(আলে ইমরান:২৭)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa Sb., Berhampur, Murshidabad

## যুগ ইমামের বাণী

**যার মধ্যে ইসলামের সম্মানের জন্য আত্মাভিমান নেই, খোদা তা'লা তার সম্মান ও আত্মাভিমানের পরোয়া করেন না।"**

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Ali Molla & Jahanara Bibi From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (s)

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মহানবী (সা.) যখন নিজ তাঁবুতে ফিরে আসেন তখন শায়বা বিন উসমান (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হন। মহানবী (সা.) তখন তাকে বলেন, হে শায়বা! তুমি সে সময় যা কিছু পরিকল্পনা করছিলে, তার চেয়ে এখন খোদা তা'লা তোমার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন- সেটি উত্তম। এরপর মহানবী (সা.) শায়বাকে সেই সকল বিষয় খুলে বলেন যা শায়বা যুদ্ধের ময়দানে হৃদয়ে লুকিয়ে রেখেছিল। শায়বা তখন মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিজের পূর্বের সকল কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। মহানবী (সা.) তার জন্য দোয়া করেন এবং বলেন, "গাফারাল্লাহু লাকা' অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন।

[দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৫৮]

একইভাবে নুযায়ের বিন হারেসের কুমতলব এবং তার উত্তম পরিণতিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। মক্কা থেকে খারাপ উদ্দেশ্য যারা হুনাইন অভিমুখী সৈন্যবাহিনীর সাথে যোগ দিয়েছিল তাদের মধ্যে একজন ছিল নুযায়ের বিন হারেস। সে কুরাইশ নেতাদের একজন ছিল এবং তার ভাই বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেন, আমি আমার কিছু সঙ্গীসহ এই অভিপ্রায়ে হুনাইন অভিমুখে যাত্রা করেছিলাম যে, সুযোগ পাওয়ামাত্রইমুশরিকদের দলের আক্রমণকারীদের সাথে যোগ দেবো। আর মুসলমানরা যখন প্রথমদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে তখন আমি মহানবী (সা.)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তঁ ার দিকে অগ্রসর হই। কিন্তু যখনই আমি তাঁর দিকে অগ্রসর হবার চিন্তা করি তখন আমি দেখি, তাঁর চারপাশে সাদা চেহারার কিছু লোক রয়েছে, যারা আমাকে বলছিল, এখান থেকে দূর হও! তাদের কণ্ঠে এমন ভীতিকর কিছু ছিল যে, আমি ভয় পেয়ে যাই আর আমি কাঁপতে থাকি। কিছু ক্ষণ পরেইমুসলমানরা পুনরায় জড়ো হতে থাকে আর শত্রুদের ওপর আক্রমণ করে বসে। আমি তখন সেখান থেকে ফিরে যাই এবং গাছপালার আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়ি। এভাবে কয়েক দিন পর্যন্ত আমি লুকিয়ে থাকি, কেননা যা কিছু আমি দেখেছিলাম সেই আতঙ্ক আমার মন থেকে দূর হচ্ছিল না। এরপর আমি জানতে পারি, মহানবী (সা.) তায়েফের দিকে চলে গেছেনএবং সেখান থেকে জিরানা গিয়ে পৌঁছেছেন। [এটি যুদ্ধ শেষ হবার পরের কথা।] আমি চিন্তা করি, এখন ইসলামের বিজয় হয়ে গেছে এবং অধিকাংশ মানুষ ইসলাম কবুল করে নিয়েছে ,তাই আমিও মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে যাই। আমি গোপনে জিরানা গিয়ে মুসলমানদের সাথে মিলিত হই। মহানবী (সা.) আমাকে দেখে চিনে ফেলেন এবং বলেন, তুমি কি নুযায়ের? আমি নিবেদন করি, জি, হুযু র! আমিই। তখন মহানবী (সা.) বলেন, হুনাইনের যুদ্ধে তুমি যে (মন্দ) পরিকল্পনা করেছিলে তা থেকে এটি উত্তম। আর আল্লাহ্তোমার এবং তোমার সেই মন্দ পরিকল্পনার মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। নুযায়ের বর্ণনা করে, আমি একথা শোনামাত্র দ্রুত মহানবী (সা.)-এর দিকে এগিয়ে যাই আর নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য যদি থাকত তাহলে সে আমার কোনো উপকারে আসত। এরপর সে কলেমা শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করে। মহানবী (সা.) তার জন্য দোয়া করে বলেন, 'আল্লাহুম্মা জিদহু সাবাতান' অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তাকে অধিক দৃঢ়তা প্রদান করো। নুযায়ের বলে, আল্লাহ্‌র শপথ! মহানবী (সা.)-এর দোয়ার কল্যাণে আমার হৃদয় দৃঢ়তার দিক থেকে পাথরসম হয়ে যায়। অতঃপর মহানবী (সা.) বলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র- যিনি তাকে সঠিক পথপ্রদর্শন করেছেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩২১-৩২২)

হুনাইনের যুদ্ধের পর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করার সময় মহানবী (সা.) কতিপয় কুরাইশ নেতৃস্থানীয় নবদীক্ষিত মুসলমানের মনস্তুষ্টির জন্য একশ করে উট প্রদান করেছিলেন। নুযায়ের বিন হারেসও তাদের অন্যতম। তিনি তখন এতটাই আত্মমর্যাদা প্রদর্শন করেন, যা তার ঈমানের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা লাভের জন্য মহানবী (সা.)-এর দোয়ার সু প্রভাব ছিল। এক ব্যক্তি এসে তাকে সংবাদ দেয়, মহানবী (সা.) আপনাকে একশ উট প্রদানের ঘোষণা দিয়েছেন, সুতরাং উটগুলো নিয়ে নিন। এটি শুনে নুযায়ের তাকে বলেন, মহানবী (সা.) তো মনস্তুষ্টির জন্য এগুলো দিচ্ছেন, এজন্য আমি এই উট নেব না; অর্থাৎ আমি তো আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে ইসলামের ওপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রয়েছি, আমার মনস্তুষ্টির জন্য এমন সম্পদের কোনো প্রয়োজন নেই। অবশ্য পরক্ষণে নিজেই বলেন, আমি তো মহানবী (সা.)-এর নিকট এই সম্পদ চাই নি আর কোনো যাচনাও করি নি। এটি তো মহানবী (সা.) নিজ থেকে দান করেছেন এবং উপহারস্বরূপ দিয়েছেন, তাই এটি নিতে অস্বীকৃতি জানানো উচিত নয়। তিনি সংবাদ প্রদানকারীকে সেসব উট থেকে ১০টি উট দিয়ে দেন এবং বাকি উট নিজে রাখেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩০৭)

পরবর্তীতে নুযায়ের প্রায়ই একথার উল্লেখ করতেন যে, খোদা তা'লার অশেষ কৃপা-আমরা সেই শিরকে নিপতিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করি নি, যার ওপর আমাদের পিতৃপুরুষরাপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তার ইসলাম খুবই উন্নত মানের ছিল। তিনি হিজরত করে মদীনায় চলে যান এবং সেখান থেকে জিহাদের উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমন করেন। অতঃপর ১৫ হিজরীতে ইয়ারমুক যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। বাকি ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে বর্ণনা করা হবে। (আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)

**** **** ****

## লজ্জাশীল পোশাক এবং পর্দা আমাদের ঈমানকে সুরক্ষিত রাখার জন্য আবশ্যক। যদি আমরা ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে চাই তবে এর শিক্ষামালা মেনে চলতে হবে।

### সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশের আলোকে পর্দার গুরুত্ব

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) ১৩ জানুয়ারী ২০১৭ তারিখে প্রদত্ত খুতবায় বলেন:

"প্রথম কথা যা আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত তা হল এই যে, যদি আমরা ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে চাই তবে এর শিক্ষামালাকে মেনে চলতে হবে। যদি আমরা ঘোষণা দিয়ে থাকি যে, আমরা মুসলমান এবং এই ধর্মের উপর আমরা প্রতিষ্ঠিত তবে এই আদেশমালা মেনে চলতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসুল (সা.)-এর নির্দেশ মেনে চলতে হবে।

সুতরাং লজ্জাশীল পোশাক এবং পর্দা আমাদের ঈমানকে সুরক্ষিত রাখার জন্য আবশ্যক। প্রত্যেক আহমদী কন্যা-সন্তান যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে মান্য করে, সে ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। একজন আহমদী সন্তান, একজন আহমদী যুবক এবং একজন আহমদী মহিলা যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে মান্য করেছে তারা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। এই প্রধান্য দেওয়া তখনই প্রমাণিত হবে যখন ধর্মের শিক্ষার উপর অনুশীলন হবে। এটিও আমাদের সৌভাগ্য যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদের জন্য প্রত্যেকটি বিষয় স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছেন। তিনি (আ.) পর্দাহীনতা এবং লজ্জাহীনতা সম্পর্কে একস্থানে বলেন-

" ইউরোপের ন্যায় পর্দাহীনতার উপরও মানুষ জোর দিচ্ছে, কিন্তু এটি সম্পূর্ণ গর্হিত কর্ম। মহিলাদের এই স্বাধীনতাই সমস্ত প্রকারের বিশৃঙ্খলা ও অবাধ্যতাপূর্ণ আচরণের মূল। যে সমস্ত দেশ এই ধরণের স্বাধীনতাকে প্রচলন দিয়েছে তাদের নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটু অনুমান করুন। যদি মহিলাদের স্বাধীনতা এবং পর্দাহীনতার ফলে তাদের সতীত্ব ও পবিত্রতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে তবে আমরা স্বীকার করব যে, আমরা ভুল। কিন্তু নারী ও পুরুষ যখন যৌবনে পদার্পণ করে আর সেই সময় তারা লাগামহীন হয়ে পর্দাহীনতা অবলম্বন করে তখন তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কোন বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছাবে তা স্পষ্টরূপে অনুমান করা যায়। "

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৪-১৩৫)

বর্তমান যুগে আমরা সমাজের মধ্যে যে সমস্ত কদাচার দেখতে পাই তা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রত্যেকটি বাক্যকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত করছে। অতএব প্রতেক আহমদী নারী ও পুরুষের উচিত নিজেদের সম্ভ্রমশীলতার উচ্চ মান বজায় রেখে সমাজের কলুষতা থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করা। 'পর্দা কেন আবশ্যক'- এমন প্রশ্নের অবতারণা করা বা পর্দার বিষয়ে হীনমন্যতার শিকার হওয়া উচিত নয়।"

আমরা দোয়া করি যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পর্দার গুরুত্ব অনুধাবন করার তৌফিক দান করেন। আমীন

*(নাযারত ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান)*

# ঈদুল আযহার খুতবা

**হযরত আবু বকর (রা.) এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে বলেন,হে রসুলুল্লাহ্! এটি আপনার দ্বারা প্রেরিত সেনাভিযানগুলির মধ্যে একটি, যা আপনি প্রেরণ করবেন। এর কিছু কিছু বিষয় আপনার পছন্দ হবে আর কিছু অংশ আপনার নিকট আপত্তিজনক হবে। অতঃপর আপনি আলিকে প্রেরণ করবেন। তিনি বিষয়টিতে সহজসাধ্যতা নিয়ে আসবেন। অর্থাৎ বিষয়টিকে ত্রুটিমুক্ত করবেন।**

**মহানবী (সা.) যখন কোন বাহিনী পাঠাতেন, তখন তিনি তাদের নির্দেশ দিতেন যেন তারা যুদ্ধ শুরু করতে তাড়াহুড়ো না করে। ধৈর্য ও নম্রতা অবলম্বন করতে বলেন এবং শত্রুপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার আগে তাদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাতে বলতেন, ইসলামের বিধান সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে বলতেন যাতে সত্য পরিষ্কার হয়ে যায়। আর যেখানে আজানের ধ্বনি শোনা যায়, সেখানে আক্রমণ না করার নির্দেশ দিতেন।**

**সংঘষের ঘটনাটির পেছনে পুরনো হিংসা, বিদ্বেষ ও প্রতিশোধের মনোভাব সক্রিয় ছিল। যখন নবী করীম (সা.) বললেন,‘অতীতের বিষয়গুলো পিষ্ট করে দাও”, তখন এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে তাদের অন্তরে পুরনো শত্রুতার আগুন ছিল, আর সেটাই হত্যার প্রকৃত কারণ ছিল।**

**নবী করীম (সা.) হযরত খালিদকে বলেন: “আমার সাহাবিদের সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করো না। আল্লাহ্‌র কসম! যদি তুমি উহুদের মতো একটি পর্বতের সমপরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় কর, তবুও আমার সাহাবিদের যে মর্যদা আছে, তুতি তার সমান মর্যাদা পেতে পারবে না। কারণ, তারা সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্‌র স্মরণে নিমগ্ন থেকে এই মর্যাদা লাভ করেছে।”**

সৈয়্যদনা আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৫ আগস্ট, ২০২৫, এর জুমআর খুতবা (১৫ জহুর, ১৪০৪ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

বিগত জুমআয় আমি তিনটি বড় মূর্তি ভূপাতিত করার ঘটনা সম্পর্কে বলেছিলাম। এর আরও বিস্তারিত বিবরণ হল, হযরত সাআদ বিন যায়েদ আশহালি’-র সেনাভিযান, যা রমযান ৮ম হিজরীতে মানাহ’ অভিমুখে প্রেরিত হয়েছিল। রসুল করীম (সা.) চব্বিশ রমযান আট হিজরীতে হযরত সাআদ বিন যায়েদকে মানাত মূর্তি অভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন। লোহিত সাগরের তীরে কুদায়েদ-এর নিকট মুশাল্লাল নাম স্থানে এটি স্থাপিত ছিল। এই কারণেই একে ‘মুশাল্লাল’ সেনাভিযানও বলা হয়।

(শারাহ যুরকানি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৯০-৪৯১) (বুখারী কিতাবুত তফসীর, হাদীস-৪৮৬১) (মিন মুয়ারিকিল ইসলাম, ৯ম খণ্ড, পৃ: ১২)

হযরত সাআদ বিন যায়েদ আশহালি কুড়িজন অশ্বারোহী সৈনিক নিয়ে রওনা হন। তিনি যখন সেখানে পৌঁছলেন, তখন সেখানে এক তত্ত্বধায়কও ছিল। তত্ত্বধায়ক হযরত সাআদকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি চাও? তিনি উত্তর দিলেন, মানাতকে ভূপাতিত করতে চাই। সে বলল, তুমি আবার এই কাজ? অর্থাৎ তোমার জন্য এই কাজ করা অসাধ্য। হযরত সাআদ (রা.) সেই মূর্তির দিকে অগ্রসর হন। জানি না এটা সত্য কি না, অনেক সময় ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করার জন্য এমন বর্ণনা করা হয়। যাইহোক বর্ণনাকারী বলেন, সেই সময় একজন বিবস্ত্র কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা, যার মাথার চুল এলোমেলো ছিল, ঘর থেকে বের হল। তত্ত্বাবধায়ক মূর্তিকে বলল,হে মানাত! তোমার প্রকোপ অবতীর্ণ কর। বর্ণিত হয়, এরপর হযরত সাআদ বিন আশহালি সেই তত্ত্বধায়ককে হত্যা করেন। হত্যার এই বর্ণনা যদি সঠিক হয়, তবে সম্ভবত তত্ত্বধায়ক মোকাবেলার করার চেষ্টা করেছিল এবং সম্মুখ যুদ্ধে সে নিহত হয়েছিল। কেবল অভিসম্পাত দেওয়ার জন্য হত্যা করা তো ইসলামের শিক্ষাই নয়। আর এটা যথোচিতও বলে মনে হয় না। আঁ হযরত (সা.)-এর সর্বজনীন নির্দেশাবলীও এর পরিপন্থী। যাইহোক তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা মূর্তির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং তা ভেঙ্গে ফেলেন। অতঃপর সঙ্গী সাথি সহকারে রসুল করীম (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন।

### মহানবী (সা.)-এর বাণী

**আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: “সর্বদা সত্য কথা বল, যখন তোমাদের কাছে আমানত রক্ষিত হয়, তখন তা আত্মসাৎ করিও না এবং প্রতিবেশীর সহিত সর্বদা সদয় আচরণ কর।” (বাইহাকি ফি শোবিল ঈমান)**

দোয়াপ্রার্থী: Sadique Mahdi Hasan, Bithari, 24 PGS (N)

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ:১১,১১২) (শারাহ যুরকানি, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৪৯০-৪৯১)

ইবনে হিশাম লেখেন, রসুল করীম (সা.) মানাতের দিকে আবু সুফিয়ান বিন হারবকে রওনা করেছিলেন। একথাও বলা হয় যে, এই কাজ করেছিলেন হযরত আলি (রা.)। তবে ওয়াকিদি এবং ইবনে সাআদ-এর মতে হযরত সাআদ বিন যায়েদ এই মূর্তি ভূপাতিত করেছিলেন।

(সূত্র: আললউলুল মাকনুন, সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২০৮) এছাড়াও অন্যান্য রেওয়ায়েতেও যদি ওয়াকিদি-র হয়ে থাকে,তবে হতে পারে কিছু অতিরিক্ত কথাও সংযুক্ত হয়েছে।

নাখলা অভিমুখে সারিয়া হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ২৫ রমযান ৮ম হিজরী/ ৬২৯ সালের জানুয়ারী মাসে সংঘটিত হয়েছিল। ২৫ শে রমযানুল মুবারক উজ্জা নামে কুরায়েশদের এক প্রসিদ্ধ মূর্তিকে ভূপাতিত করার উদ্দেশ্যে নবী করীম (সা.) হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ এর নেতৃত্বে ত্রিশ জন সদস্য সম্বলিত একটি দলকে নাখলা অভিমুখে রওনা করেন। নাখলা হল মক্কা উপত্যকার পূর্বে একদিন-এর দূরত্বে অবস্থিত মক্কা ও তায়েখের মধ্যবতী স্থানের একটি শহর। নাখলা নামক এই স্থানে একটি বাড়ি ছিল যার তত্ত্বধায়ক ছিল বনু শায়বান গোত্র। এরা বনু হাশিম গোত্রের মিত্র ছিল। এখানেই ছিল কুরায়েশদের সবথেকে বড় মূর্তি উজ্জা। ইমাম বাইহাকির পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এর ঘরটি তিনটি বাবলা গাছ দ্বারা নির্মিত ছিল। অর্থাৎ এর ঘরের চারপাশে বাবলার গাছ ছিল, মাঝে ছিল ঘরটি। ইবনে ইসহাক বলেন- যখন উজ্জার তত্ত্বাবধায়ক হযরত খালিদ-এর আগমণ সম্পর্কে জানতে পারল, তখন সে মূর্তির উপর তরবারি ঝুলিয়ে রেখে নিজে পাহাড়ে চড়ল এবং কবিতা পাঠ করতে শুরু করল যার অর্থ- হে উজ্জা! খালিদ-এর উপর এমন তীব্র আক্রমণ করো যেন কিছু বাকি না থাকে। যুদ্ধের পোশাক পরিধান কর এবং আস্তিন গুটিয়ে নাও। হে উজ্জা! তুমি যদি এই ব্যক্তি খালিদকে হত্যা না-ও কর,তবে দ্রুত তাকে সংঘটিত কোন পাপের ভাগিদার বানিয়ে দাও কিম্বা তার প্রতিশোধ গ্রহণ কর।হযরত খালিদ (রা.)নাখলা পৌঁছা মাত্রই বাবলা গাছগুলিকে কেটে ফেলেন এবং সেই ঘরটি ধূলিস্যাৎ করেন যেখানে উজ্জার মূতি ছিল। এরপর তিনি মক্কা ফিরে গিয়ে আঁ হযরত (সা.)-কে অবগত করেন। তিনি (সা.) বলেন, তুমি কি সেখানে বিশেষ কোন বিষয় লক্ষ্য করেছিলে? হযরত খালিদ অসম্মতিসূচক উত্তর দেন। আঁ হযরত (সা.) বললেন, তবে তুমি কিভাবে উজ্জাকে ধ্বংস করলে? পুনরায় গিয়ে তাকে সমূলে ধ্বংস করে এস। এই আদেশ শোনামাত্র হযরত খালিদ তা পালনার্থে অবিলম্বে প্রস্থান করেন। (উজ্জার) তত্ত্বধায়করা যখন হযরত খালিদকে পুনরায় আসতে দেখল,তখন তারা পাহাড়ে চড়ে বসল। তারা বলছিল, হে উজ্জা! এদেরকে তুমি ধ্বংস করে দাও। সেই মূর্তিকক্ষ থেকে এলোমেলো কেশবিশিষ্ট এক কৃষ্ণাঙ্গ বেরিয়ে আসে (এখানেও তারা হয়তো মহিলা রেখেছিল) আর হযরত খালিদ এই পঙক্তি পাঠ করছিলেন। আরবী পঙক্তিটি হল-

يَا عُزَّ كُفْرَانَكِ لَا سُبْحَانَكِ إِنِّي رَأَيْتُ اللهَ قَدْ أَهَانَكِ

হে উজ্জা! আমি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করছি। তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি না। আমি দেখেছি, আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে লাঞ্ছিত করেছেন।

এরপর তিনি মক্কায় ফিরে গিয়ে আঁ হযরত (সা.)-এর সমীপে ঘটনার বিবরণ উপস্থাপন করলে আঁ হযরত (সা.) বললেন- نَعَمْ تِلْكَ الْعُزَّى، وَقَدْ يَئِسَتْ أَنْ تُعْبَدَ بِبِلَادِكُمْ أَبَدًا হ্যাঁ, এটা উজ্জা যে এই কারণে হতাশ হয়ে পড়েছে যে, তোমাদের শহরগুলিতে এখন তার আর কোন উপাসনা হবে না।

(আসসীরাতুন নববিয়াহ লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৭৬০-৭৬১) (ফারহাঙ্গে সীরাত, প্রণেতা:সৈয়্যদ ফজলুর রহমান, পৃ: ২৯৯) (শারাহ যুরকানি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৮৭-৪৯০)

সুওয়া ছিল মদিনা থেকে পশ্চিম দিকের সমুদ্র উপকূলে রুহাতে বনু হুযায়েল গোত্রের মূর্তি। আর এই স্থানটি মক্কা থেকে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত। এই মূর্তির মুখটি ছিল নারীর। মানুষ এই মূর্তিকে সম্মান করত এবং এটিকে প্রদক্ষিণ করত। এর তত্ত্বধায়ক ছিল বনু লাইহানন যারা হুযায়েল গোত্রেরই একটি অংশ ছিল।

(ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ১৩৬) (শারাহ আল আলামাত আল যুরকানি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৯০) (আল লউলুল মাকনুন, সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২১০)

কুরআন করীমে কতিপয় মূর্তির নাম উল্লেখিত হয়েছে। এতে এই মূর্তির নামও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন সূরা নূহতে বর্ণিত হয়েছে-

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا ۙ وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا

'এবং তাহারা (পরস্পরকে) বলিতেছে, তোমরা তোমাদের মা'বুদদিগকে কখনও পরিত্যাগ করিও না, এবং পরিত্যাগ করিও না ওয়াদ্দকে এবং না সুওয়া'আকে, এবং না ইয়াওসকে ও ইয়া'উককে এবং নাসরকে।"

(সূরা নূহ, আয়াত: ২৪)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নূহ জাতিতে যে মূর্তি ছিল, পরবর্তীতে তা আরবদের মধ্যে চলে আসে এবং ওয়াদ্দ মূর্তি ছিল কালব গোত্রের যা দুমাতুল জান্দালে বসবাস করত। অপরদিকে সুওয়া ছিল হুযায়েল গোত্রের মূর্তি এবং ইয়াগুস ছিল মুরাদ গোত্রে। এরপর তারা বনু গাতাইফ গোত্রের সঙ্গে যোগ দেয় যারা সাবা শহরের নিকটস্থ জুরুফে বসবাস করত। অপরদিকে ইয়াউক ছিল হামদান গোত্রের অংশ এবং নাসার ছিল হিমইয়ার ছিল জুল কালা-গোত্রের বংশধর ছিল। প্রকৃতপক্ষে এগুলো হল সেই সবব পুণ্যবানদের নাম যারা হযরত নূহ (আ.)-এর জাতির বংশধর ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর শয়তান তাঁর জাতির মানুষের হৃদয়ে এই ধারণার সঞ্চার করে যে, যে-সব স্থানে তিনি ওঠাবসা করতেন সেখানে মূর্তি তৈরী করে দাও, তাঁর নামে এই সব মূর্তিগুলির নামকরণ কর। অতএব, তারা এমনটাই করে। সেই সব মানুষের উপাসনা করা হত না, কিন্তু যখন তারা ধ্বংস হয়ে গলে এবং প্রকৃত তথ্য হারিয়ে গেল , তখন তারা মূর্তি পুজা শুরু করল কিম্বা তাদের নামে প্রতিরূপ তৈরী করে তাদের পুজা শুরু করল।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুত তফসীর, হাদীস-৪৯২০)

হযরত আমর বিন আস যখন রুহাত নাম স্থানে সুওয়া (মূর্তি)-র কাছে পৌঁছলেন,তখন তিনি তত্ত্বধায়কের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তিনি তাকে বলেন, 'আমি রসুল করীম (সা.)-এর আদেশে এই মূর্তিকে ভেঙ্গে ফেলতে এসেছি।' সে উত্তর দিল, এই মূর্তি মোটেই ভেঙ্গে ফেলার ক্ষমতা তোমার নেই। তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, সে উত্তর দিল- তোমাকে অবশ্যই রুখে দেওয়া হবে। তিনি বললেন, তোমার প্রতি আক্ষেপ। এ কি শুনতে ও দেখতে পারে? এরপর তিনি এগিয়ে এসে সেটিকে ভেঙ্গে ফেলেন এবং সঙ্গীদেরকে বলেন, তারা যেন সেই ঘরটিকেও গুঁড়িয়ে দেয় যেটি মূর্তির সঙ্গে নির্মিত হয়েছিল। তারা সেই ঘরটিকেও ভেঙ্গে ফেলেন। এরপর তিনি সেই তত্ত্বধায়ককে জিজ্ঞাসা করেন জিজ্ঞাসা করলেন, এখন বল? সে তার উপাস্যের অবস্থা দেখে বলে উঠল-আমি আল্লাহর আনুগত্য করছি এবং ইসলাম গ্রহণ করছি।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ২য় ভাগ, পৃ: ১১১) (শারাহ আল্লামা যুরকানি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৯০) (আল লউলুল মাকনুন, এনসাক্লোপেডিয়া, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২১০)

এই দৃষ্টিকোণ থেকেও এবিষয়ের সত্যায়ন হয় যে, প্রথমে তত্ত্বাবধায়ক বা অন্য কাউকে হত্যা করার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা কোন অবস্থাতেই প্রশ্নাতীত নয়।

বনু জাযিমা অভিমুখে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ-এর নেতৃত্বে সেনাভিযানও ৮ম হিজরীতেই সংঘটিত হয়েছিল। মক্কা বিজয়ের পর হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ উজ্জা মূর্তিকে ভূপাতিত করে ফিরে এলে আঁ হযরত (সা.) তাঁকে বনু জাযিমা গোত্রের দিকে প্রেরণ করেন। এটি ছিল বনু কিনানা গোত্রের একটি শাখা যারা মক্কা সংলগ্ন ইয়া লামলাম-এর বসবাস করত। নবী করীম (সা.) হযরত খালিদকে বলেন: এই গোত্রকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি (সা.) এও বলেছিলেন যে, এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। আঁ হযরত (সা.)-এর এই নীতিগত নির্দেশ সব সময় ছিল- মনে রাখবে, যুদ্ধ করবে না। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ মুহাজির, আনসার ও বনু সুলায়েম-এর সাড়ে তিনশ সদস্য নিয়ে রওনা হন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাআদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১১২)

হযরত খালিদ (রা.) যখন সেখানে পৌঁছলেন, তিনি দেখলেন, মানুষ অস্ত্র ধারণ করে আছে, যেন তারা আক্রমণ করতে উদ্যত। তিনি তাদেরকে বললেন, অস্ত্র রেখে দাও। লোকে তো ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে। খালিদ -এর একথা শুনে তাদের মধ্য থেকে জাহদাম নামের এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং নিজের জাতিকে সম্বোধন করে বলল: হে বনু জাযিমা! অস্ত্র সমর্পণ করো না। এ হল খালিদ। অস্ত্র সমর্পণের পর তোমাদেরকে গ্রেপ্তারি ও মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে।অতএব, আমি কখনই অস্ত্র সমর্পণ করব না। একথা শুনে বাকিরা জাহদামকে বোঝালো, কেন তুমি আমাদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে এত তৎপর হচ্ছ। অস্ত্র সমর্পণ কর। লোকেরা তাকে বোঝাতে থাকে, অবশেষে তার থেকে অস্ত্র নিয়ে নেওয়া হয়। অস্ত্র সমর্পণের পর তাদেরকে বন্দী করা হয়। এটিও রেওয়াতে বর্ণিত আছে। প্রত্যেক মুসলমানকে একজন-দুজন করে কয়েদী দেওয়া হয় আর সারা রাত তারা বন্দি থাকে।

(আসসীরাতুন নববীয়াহ লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৭৫৫) (সীরাত এনসাইক্লোপিডিয়া, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২১৫)

হয়তো এজন্য কয়েদ করা হয়েছিল যে, তারা অস্ত্র ধারণ করে রেখেছিল আর তাদের অভিসন্ধি সম্পর্কে জানা ছিল না। যাইহোক একটি রেওয়াতে অনুসারে, হযরত খালিদ (রা.) যখন সেখানে পৌঁছলেন এবং তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন, তখন তারা 'আসলামনা' বলার পরিবর্তে 'সাবানা'-'সাবানা' (আমরা ধর্ম ত্যাগ করেছি) বলতে শুরু করল। এতে হযরত খালিদ (রা.)-এর মনে এই বিভ্রান্তি তৈরী হয় যে, এরা তো মুসলমান নয়। অতএব, তিনি তাদেরকে হত্যা করার নিদান দেন। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪৩৩৯) এই ব্যাখ্যা করা হয়।

ইবনে সাআদ বর্ণনা করেন, খালিদ (রা.) যখন তাদের কাছে পৌঁছলেন, তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোন্ ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত? তারা উত্তর দিল, আমরা মুসলমান, নামায পড়ি ইত্যাদি। হযরত খালিদ (রা.) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তবে তোমরা অস্ত্র কেন ধারণ করে রেখেছ? তারা উত্তর দিল, আমাদের ও আরবদের একটি গোত্রের মধ্যে শত্রুতা চলছে। আমরা আশঙ্কা করছিলাম যে, এটা সেই গোষ্ঠী। এই কারণে আমরা অস্ত্র ধারণ করেছিলাম।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাআদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১১২)

যদি এই ঘটনার কোন ধর্মীয় ব্যাখ্যা খোঁজা হয়, তবে এই ঘটনা থেকে জানা যায় যে, হযরত খালিদ (রা.) সতর্ক হয়ে যান এবং বন্দীদের আন্তরিকতা নিয়ে কিছুটা সন্দিহান হয়েছিলেন। যাইহোক রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, এই কয়েদীরা নামাযও পড়ছিল আর বাহ্যিকভাবে মুসলমান বলেও মনে হচ্ছিল। কিন্তু সম্ভবত, এই কয়েদীদের মধ্যে কিছু কয়েদী হয়ত জাহদাম ও তার সমর্থক ছিল, যারা বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ করেছিল, আর হযরত খালিদ তাদের আন্তরিকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হতে পারছিলেন না।অধিকন্তু তাদের মধ্যেই কতিপয় সদস্য 'সাবা'না-সাবা'না' ধ্বনি দিয়ে হযরত খালিদের উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছিল। ফলস্বরূপ, তিনি এক রাতের শেষ প্রহরে সিদ্ধান্ত দেন যে এই কয়েদীদের হত্যা করাই সবচেয়ে উপযুক্ত হবে। এতে কিছু মুসলমান নিজেদের কয়েদীদের হত্যা করে ফেলে। কিন্তু মুহাজির ও আনসারদের দল, যারা পুরোনো মুসলমান ছিল, তারা খালিদের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেন নি এবং তারা কয়েদীদের হত্যা করেন নি। আনসারদের নেতা আবু উসায়েদ সায়েদী হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের কাছে এসে বলেন, এরা মুসলমান। এদেরকে হত্যা করা সঙ্গত হবে না। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর হযরত এবং হযরত সালিম মৌলা আবু হুযাইফা (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-এর সিদ্ধান্তে একমত হতে পারেন নি এবং অন্যান্য সঙ্গীদেরকে নিজেদের আয়ত্বে থাকা কয়েদীদের হত্যা করতে নিষেধ করেন। যে সমস্ত কয়েদী মুক্তি পেয়েছিল, তাদের মধ্য থেকে একজন মদিনায় পৌঁছে রসুল করীম (সা.)-এর নিকট পরিস্থিতি বর্ণনা করেন। আঁ হযরত (সা.) জিজ্ঞাসা করেন, কেউ কি খালিদ-এর

**মহান আল্লাহ্‌র বাণী**

**নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিযকদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়।** (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Sk Imam Hossain sb, Khundanga, Bankura**

কথার বিরোধিতা করে নি কিম্বা তাকে বাধা দেয় নি? সে উত্তর দিল, একজন ফর্সা রঙের মাঝারি উচ্চতার ব্যক্তি ছিল এবং একজন ছিল দীর্ঘাকায়। তারা খালিদ-এর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তাদের মধ্যে একজন বেশ উচ্চ স্বরে কথা বলেছিলেন। হযরত উমর (রা.) সেই সময় মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি রসুল করীম (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করলেন, হুযুর! একজন ছিল আমার ছেলে আব্দুল্লাহ। অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) দীর্ঘাকায় ছিলেন এবং দ্বিতীয়জন সালিম মৌলা আবু হুযাইফা ছিলেন।

(আল লউলুল মাকনুন, সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২১৫-২১৭) (আসীরাতুন নববীয়াহ লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৭৬৬)

আঁ হযরত (সা.) যখন সমস্ত ঘটনা জানতে পারলেন, তখন তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হলেন।তিনি (সা.) বললেন, আমি তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ খালিদকে দিই নি। আমি কেবল তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাতে বলেছিলাম। এরপর আঁ হযরত (সা.) নিজের দুই হাত তুলে দুইবার খোদার দরবারে নিবেদন করেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَبْرَاُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِد অর্থাৎ খালিদ যা কিছু করেছে তা থেকে নিজেকে দায়মুক্ত রাখছি। অনুরূপভাবে খালিদ বিন ওয়ালিদের প্রতি নিজের অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করে বলেন, কেন তুমি এত তাড়াহুড়ো করলে? ভালভাবে তদন্ত করা উচিত ছিল।

(আল লউলুল মাকনুন, সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২১৭) (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪৩৩৯)

এরপর আঁ হযরত (সা.) হযরত আলিকে বনু জাজিমার অভিমুখে তাদের নিহতদের রক্তপণ পরিশোধ ও সমস্ত ঘটনার তদন্ত করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। হযরত আলি (রা.) সেখানে গিয়ে সমস্ত নিহতদের পরিবারকে তাদের রক্তপণ পরিশোধ করেন এবং মুসলমানেরা তাদের যে সব সম্পদ হস্তগত করেছিল, সেগুলি তাদের ফিরিয়ে দেন। এমনকি কাঠের সেই বাসনটিও ফেরত দেন যাতে কুকুর পানি খেত। সকলকে রক্তপণ ও অন্যনী অর্থ পরিশোধ করার পর হযরত আলী (রা.)-এর কাছে কিছু সম্পদ অবশিষ্ট থেকে যায়। তখন তিনি (রা.) বনু জাযিমা-র সদস্যদের জিজ্ঞাসা করেন, এমন কোন ব্যক্তি কি অবশিষ্ট আছে যার ক্ষতিপুরণ দেওয়া হয় নি? সকলে উত্তর দিল, না। অতঃপর তিনি অবশিষ্ট সম্পদও তাদেরকেই দিয়ে দেন এবং বলেন, আমি এই সম্পদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর পক্ষ থেকে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে দিচ্ছি, যাতে সেই সব সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণও হয়ে যায় যা আল্লাহ্‌র রসুল জানেন না, এমনকি তোমরাও না। হযরত আলি (রা.) ফিরে আসেন এবং আঁ হযরত (সা.) -এর সমীপে এসে সমস্ত সংবাদ জ্ঞাপন করেন এবং একথাও বলেন যে, তাদের ছোট ছোট জিনিসও ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বাকি অবশিষ্ট সম্পদও তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। একথা শুনে আঁ হযরত (সা.) ভীষণ আনন্দিত হন এবং হযরত আলীকে বলেন: 'আসাবতা ওয়া আহসানতা' তুমি একদম সঠিক কাজ করেছ এবং খুব ভাল কাজ করেছ। এই ঘটনার পূর্বে আঁ হযরত (সা.) একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন যার বর্ণনা সীরাত ইবনে হিশাম গ্রন্থে রয়েছে। আঁ হযরত (সা.) বলেন, আমি একটি স্বপ্নে দেখলাম, এক গ্রাস হাইস (খেজুর, ঘি ও পনীর মিশ্রিত একটি খাদ্য) মুখে নিয়েছি, যেটি আমার কাছে সুস্বাদু মনে হল। কিন্তু আমি সেটি গিলে নেওয়ার সময় এর কিয়দংশ গলায় আটকে যায়। হযরত আলী গলার মধ্যে হাত দিয়ে সেটিকে বের করেন। হযরত আবু বকর (রা.) এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে বলেন,হে রসুলুল্লাহ! এটি আপনার দ্বারা প্রেরিত সেনাভিযানগুলির মধ্যে একটি, যা আপনি প্রেরণ করবেন। এর কিছু কিছু বিষয় আপনার পছন্দ হবে আর কিছু অংশ আপনার নিকট আপত্তিজনক হবে। অতঃপর আপনি আলিকে প্রেরণ করবেন। তিনি বিষয়টিতে সহজসাধ্যতা নিয়ে আসবেন। অর্থাৎ বিষয়টিকে ত্রুটিমুক্ত করবেন।

(আসসীরাতুন নববিয়াহ লি ইবনে হিশাম, পৃ:৭৫৬) (সহীহ মুসলিম, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫২)

এরপর এই সেনাভিযানের ঘটনার মাধ্যমে এই স্বপ্নটি পূর্ণতা লাভ করে। বুখারির ভাষ্যকার তথা জামাতের প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত জয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব বুখারীর ব্যাখ্যা লিখেছেন। এই সমস্ত ঘটনাবলী ও বর্ণনাবলী বিশ্লেষণ করে তিনি লেখেন, ইবনে সাআদ ও ইবনে হিশাম রচিত উভয় তাবাকাত গ্রন্থে এই অভিযানের এই মর্মে উল্লেখ রয়েছে যে, মক্কা বিজয়ের পর নবী করীম (সা.) বিভিন্ন দিকে কিছু সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন, যাতে বিভিন্ন গোত্রের মাঝে ইসলামের প্রতি তাদের আগ্রহের বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া যায়- জোর করে মুসলমান বানানো উদ্দেশ্য ছিল না। এই উদ্দেশ্যেই তিনি (সা.) হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)কে বনু জাযিমা গোত্রের দিকে রওনা করেন। ইবনে সাআদ রচিত তাবাকাত গ্রন্থে ঘটনাটি বর্ণনা করে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে-

بَعَثَهُ اِلٰى بَنِيْ جَذِيْمَةَ دَاعِيًا اِلَى الْاِسْلَامِ وَلَمْ يَبْعَثْهُ مُقَاتِلًا অর্থাৎ নবী করীম (সা.) ৮ম হিজরীর শওয়াল মাসে সাড়ে তিনশ মুহাজির ও আনসার সদস্য সহ হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে বনু কিনানার শাখা বনু জাজিমা গোত্রের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন, যারা 'ইয়া লাম লাম' -এর আশপাশের এলাকায় বসবাস করত। তিনি (সা.) তাদেরকে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করেন নি, বরং ইসলামের প্রতি আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। এই গোত্রটি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ছিল।এই অভিযানটির অপর নাম ইয়ামুল গুমাইসা। গুমাইসার অর্থ ঝর্ণার পানি। পবিত্র মক্কা সংলগ্ন বাদিয়ায় একটি স্থান, যেখানে বনু জাযিমা বসবাস করত। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (এই রেওয়াতের বর্ণনাকারী) এই অভিযানের অংশ ছিলেন। তাঁর বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। ইবনে ইসহাক ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এর থেকে জানা যায় যে, বনু জাযিমার একটি বিশেষ অংশ ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, কিন্তু অধিকাংশই মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। ইসলাম অস্বীকাকারীরা অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে শুরু করে, যে কারণে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে পরাজিত করে বন্দি করেন। তাদের মধ্যে কতিপয় নিজেদেরকে বন্দি দশায় দেখে 'সাবা'না-সাবা'না' বলে নিজেদের মুসলমান হওয়ার কথা জানাচ্ছিল। 'সাবা'না-র অর্থ আমরা 'সাবি' হয়েছি, অর্থাৎ আমরা আমাদের ধর্ম পরিবর্তন করেছি। আঁ হযরত (সা.) কে মক্কায় 'সাবি' বলে ব্যঙ্গাত্মক নামে ডাকা হত, এবং এই শব্দটি তখন অপমানসূচক অর্থে ব্যবহৃত হত, যা বোঝাতো যে কেউ পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করেছে।

তবে যারা যুদ্ধ করছিল,তারা স্পষ্টভাবে বা আন্তরিকভাবে ইসলামের ঘোষণা দেয় নি; বরং তারা এই অস্পষ্ট শব্দ 'সাবা'না' ব্যবহার করেছিল। এই অস্পষ্ট ঘোষণা তাদের সংঘর্ষে নিহত হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে নি। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের আদেশে তাঁর বন্দিদের হত্যা করেন নি আর আঁ হযরত (সা.)-এর নিকট এই ঘটনার উল্লেখ করেন। আঁ হযরত (সা.) ঘটনা শুনে হাত তুলে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের এই কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন বলে ঘোষণা করেন এবং নিজের অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেন। ইবনে ইসহাক এবং ইবনে সাআদ-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে, মুজাজিদীনদের অংশ হিসেবে বনু সুলায়েম এবং মুদলাজ গোত্রের যোদ্ধারাও ছিলেন, যারা বনু জাজিমার মতই বনু কিনানা গোত্রের শাখা ছিল। এবং অতীতে কোন এক যুদ্ধে জাজিমার ক্ষতি করেছিল। ফলে, বনু জাজিমা যখন বনু সুলায়েম এবং মুদলাজকে ইসলামের সেনাবাহিনীর সঙ্গে দেখল, তখন তারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্র ধারণ করল।

হযরত খালিদ তাদেরকে বললেন, "লোকেরা তো ইসলাম গ্রহণ করেছে- তবে যুদ্ধ প্রয়োজন কী? অস্ত্র সমর্পণ কর। যেমনটি ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। জাহদাম নামের এক গোত্রপ্রধান তার সম্প্রদায়কে পরামর্শ দিল, অস্ত্র সমর্পণ করো না, অন্যথায় তোমাদের হত্যা করা হবে অথবা বন্দি করা হবে। তার জাতির কিছু লোক তাকে বাধা দিয়ে বলল, রক্তপাত কেন ঘটাতে চাও? লোকেরা তো মুসলমান হয়ে গিয়েছে।

ইবনে হিশামের রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, বনু কিনানার এই গোত্রগুলোকে পূর্ববর্তী গোত্রগত শত্রুতার প্রতিশোধও প্রভাবিত করেছিল।ফলে, কিছু লোক যুদ্ধ করেছে, কেউ নিহত হয়েছে আবার কেউ বন্দি হয়েছে। দেখা যায়, বনু সুলায়েমের যোদ্ধারা হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের নিদানে পূর্ববর্তী শত্রুতার কারণে নিজেদের কয়েকজন বন্দিদের হত্যা করেছে আর তাদের ইসলাম গ্রহণকের ঘোষণাকে কপটতার সঙ্গে তুলনা করেছে। তবে মুহাজির ও আনসাররা খালিদের এই নিদান মেনে নেন নি এবং নিজেদের আয়ত্বে থাকা বন্দিদেরকে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা পর মুক্ত করে দিয়েছেন। তারা তাদেরকে হত্যা করার পরিবর্তে মুক্ত করে দেন।


## যুগ ইমামের বাণী

পরনিন্দা ও পরচর্চা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা উচিত।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড,পৃ: ৪০৭)

দোয়াপ্রার্থী: Mirza Naeema Begum & Family
Bithari, 24 PGS (N)



## যুগ ইমামের বাণী

**অতএব, কুরআন শরীফ অনুধাবন করা এবং সেই অনুযায়ী হিদায়াত লাভের জন্য তাকওয়া প্রধান ও আবশ্যক বিষয়।**

**(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২১)**

দোয়াপ্রার্থী: Late-Rafiquddin Ahmad & Afifa Begum,
From- Lutful Haque Sb., Kandi ( MSD)

আঁ হযরত (সা.) এই বিষয়ে স্পষ্ট অবস্থান নেন। হযরত আব্দুল্লহ্ ইবনে উমরের (রা.) বর্ণনা অনুযায়ী হযরত খালিদের বক্তব্য একটি আদেশ ছিল না বরং একটি ফতোয়া (ধর্মীয় মতামত) ছিল, যা অধিকাংশ সাহাবা গ্রহণ করেন নি। যদি একটি একটি স্পষ্ট নির্দেশ হত, তবে সবাই তা মানতো এবং কেউ আপত্তি করত না। তবে হযরত খালিদের ফতোয়ায় কিছু ভুল পরিলক্ষিত হয়, যার ফলে নবী করীম (সা.) গভীরভাবে মর্মাহত হন। এই পরিস্থিতির প্রতিকার হিসেবে, তিনি হযরত আলিকে প্রেরণ করেন, যাতে নিহতদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। হযরত আলী প্রত্যেক নিহতদের রক্তপণ প্রদান করেন- এমনকি যাদের কুকুরও নিহত হয়েছিল,তাদের কুকুরের জন্যও ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন।

হযরত ইবনে হিশাম অনুযায়ী, শুধু নির্ধারিত রক্তপণই নয়, বরং অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয়েছিল। ইমাম বাকির-এর বর্ণনায়ও দেখা যায় যে, রসুল করীম (সা.)-এর নির্দেশে হযরত আলী এই ক্ষতিপূরণ সম্পন্ন করেন। এটি ভুলভাবে বোঝা উচিত নয় যে, হযরত খালিদ আত্মসমর্পণের পরও হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন; বরং যুদ্ধের বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে কিছু লোক নিহত হয় বা বন্দি হয়।

ইবনে সা'দের বর্ণিত হাদিসসমূহের মধ্যে একটি ইবনে ইসহাকের সূত্রে- হযরত ইবনে আবি হাদরাত আল-আসলামী (রা.) থেকে বর্ণিত, যিনি ঐ অভিযানে উপস্থিত ছিলেন। ইবনে সা'দের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে কিছু সংঘর্ষ হয়েছিল। তদ্ব্যতীত,হযরত খালিদ যখন বনু জাযিমাকে সশস্ত্র অবস্থায় দেখতে পান, তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা কেন অস্ত্র ধারণ করেছ?" তারা জবাব দেয়, "আমাদের কিছু আরব গোত্রের সঙ্গে পুরোণো শত্রুতা রয়েছে এবং আমরা আশঙ্কা করেছিলাম, তোমরাও হয়তো সেই গোত্রভুক্ত, তাই আত্মরক্ষার জন্য আমরা অস্ত্র ধারণ করেছি।"

এরপর হযরত খালিদ তাদের বন্দি করার আদেশ দেন, তাদের হাত বেঁধে মুসলিম সেনাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়।

ইমাম ইবনে হাজার এই উদ্ধৃতি উল্লেখ করার পর লিখেছেন যে, যারা যুদ্ধ করেছিল, তারা যুদ্ধের পর আত্মসমর্পণ করেছিল। সহীহ বুখারীর বর্ণনাটি সংক্ষিপ্ত, এবং যুদ্ধাভিযানের অধ্যায়ের বর্ণনাতেও ঘটনাগুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট সংযোগ দেখা যায় না।তবে সাধারণভাবে বোঝা যায় যে, এই প্রচারাভিযানের সময় যে সংঘর্ষ হয়েছিল,তা জাহিলিয়াতের যুগের কোন রক্তপাতের প্রেক্ষিতে ঘটেছিল।

কেবল 'সাবা'না (আমরা সাবি হয়েছি) শব্দ নিয়ে মতভেদ হওয়ার কারণে কিছু বন্দিকে হত্যা করা হয়েছে- এটা ধরে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়, বিশেষ করে যখন মুহাজির ও আনসারগণ প্রকাশ্যে এমন কাজের বিরোধিতা করেছিলেন। খাত্তাবি বলেন, মহানবী (সা.)-এর উক্তি: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَبْرَأُ اِلَیْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِد "হে আল্লাহ্! আমি আপনার দরবারে নিজেকে দায়মুক্ত ঘোষণা করছি যা খালিদ করেছে'- এই কথা থেকে স্পষ্ট হয় যে, মহানবী (সা.) খালিদের তড়িঘড়ি করে রায় দেওয়া এবং 'সাবা'না শব্দের প্রকৃত অর্থ যাচাই না করাকে অপছন্দ করেছেন। খালিদের দায়িত্ব ছিল যে, তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত হতেন- এই শব্দ ব্যবহার করে লোকেরা আসলে কী বোঝাতে চেয়েছিল।"

ইমাম বাকিরের বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, মহানবী (সা.) হযরত মুহাম্মদ (সা.) হযরত আলী (রা.)কে ডেকে বলেছিলেন: " এই লোকদের কাছে যাও এবং জাহিলিয়াতের কথাগুলোকে তোমার পায়ের নীচে পিষ্ট করে দাও।' তখন হযরত আলী তাদের কাছে গিয়ে প্রতিটি নিহতের রক্তপণ পরিশোধ করেন। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, সংঘষের ঘটনাটির পেছনে পুরনো হিংসা, বিদ্বেষ ও প্রতিশোধের মনোভাব সক্রিয় ছিল। যখন নবী করীম (সা.) বললেন,'অতীতের বিষয়গুলো পিষ্ট করে দাও", তখন এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে তাদের অন্তরে পুরনো শত্রুতার আগুন ছিল, আর সেটাই হত্যার প্রকৃত কারণ ছিল।

মহানবী (সা.) যখন কোন বাহিনী পাঠাতেন, তখন তিনি তাদের নির্দেশ দিতেন যেন তারা যুদ্ধ শুরু করতে তাড়াহুড়ো না করে। ধৈর্য ও নম্রতা অবলম্বন করতে বলেন এবং শত্রুপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার আগে তাদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাতে বলতেন, ইসলামের বিধান সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে বলতেন যাতে সত্য পরিষ্কার হয়ে যায়। আর যেখানে আজানের ধ্বনি শোনা যায়, সেখানে আক্রমণ না করার নির্দেশ দিতেন।

উপরিউক্ত ঘটনার প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, বনু জাদিমা গোত্র নিজেরাই ইসলাম গ্রহণের বার্তা পাঠিয়েছিল, যার পরিপ্রেক্ষিতে একটি মিশন পাঠানো হয় এবং স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয় যে,এই অভিযানের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলাম প্রচার, যুদ্ধ নয়। তাবাকাত ইবনে সা'দ -এ বর্ণিত আছে, যখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ বনু জাদিমার নিকট পৌঁছান, তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা কারা?" তারা উত্তর দেয়: "আমরা মুসলমান। আমরা নামায পড়ি, মুহাম্মদ (সা.)কে সত্য নবী হিসেবে বিশ্বাস করি, আমাদের উঠোনে মসজিদ করেছি এবং সেখানে আজান দিই। "

খালিদ আবার জিজ্ঞাসা করেন, "তবে তোমাদের কাছে অস্ত্র কেন?" তারা বলে, " আমাদের আরবদের একটি গোত্রের সঙ্গে শত্রুতা আছে, আমরা আশঙ্কা করছিলাম যে তোমরা সেই গোত্রের লোক নও তো?"এই ব্যাখ্যার পর তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার কোন বৈধতা ছিল না। মনে হয়, ইয়ালামলামের আশেপাশে অবস্থানকালে সেই পুরনো শত্রুতার আগুন আবার জ্বলে ওঠে, যার ফলে এক পক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় এবং তারা 'সাবা'না (আমরা সাবি হয়েছি/ পুরনো ধর্ম ত্যাগ করেছি) বলে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেওয়ার পরও তাদের রেহাই দেওয়া হয় নি। যেহেতু হযরত খালিদ অভিযানের প্রধান ছিলেন, তাই সমালোচনার মুখোমুখি হন।

ইবনে হিশাম উল্লেখ করেন যে, এই ঘটনার সময় হযরত খালিদ ও হযরত আব্দুর রহমান ইবনে অউফের মধ্যে মতানৈক্য ও ঝগড়া হয়। হযরত আব্দুর রহমান বলেন: عَمِلْتَ بِاَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْاِسْلَامِ 'আপনি ইসলামের মধ্যে থেকেও জাহিলিয়াতের আচরণ করছেন। "

খালিদ উত্তরে বলেন: "তুমি আমাকে এই কথা বলেছ শুধু তোমার পিতার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য।" আব্দুর রহমান বলেন: "তা ঠিক নয়। আমি আমার পিতার হত্যাকারীকে হত্যা করে তার প্রতিশোধ ইতিমধ্যেই নিয়েছি, কিন্তু আপনি আপনার চাচা ফাকিহ ইবনে মুগিরার প্রতিশোধ নিয়েছেন।"

এই বিবাদের ফলে দুজনের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়, যা নবী করীম (সা.) জানতে পারলে তিনি হযরত খালিদকে বলেন: "আমার সাহাবিদের সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করো না। আল্লাহ্‌র কসম! যদি তুমি উহুদের মতো একটি পর্বতের সমপরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় কর, তবুও আমার সাহাবিদের যে মর্যদা আছে, তুতি তার সমান মর্যাদা পেতে পারবে না। কারণ, তারা সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্‌র স্মরণে নিমগ্ন থেকে এই মর্যাদা লাভ করেছে।"

সীরাত ইবনে হিশামে ইবনে ইসহাকের আরেকটি বর্ণনাও রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, ফাকিহ ইবনে মুগিরা আল-মাখজুমি, অউফ ইবনে আব্দ অউফ আল জুহরি এবং আফফান ইবনে আবি আল-আস বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ইয়েমেনে যান। ফেরার পথে তারা বনু জাজিমা গোত্রের এমন একজন মৃত ব্যক্তির সম্পদ নিয়ে ফেরেন যিনি ইয়েমেনে মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং তারা সেটা তার উত্তরাধিকারীদের দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিয়ে আসেন। পথিমধ্যে তাদের সঙ্গে দেখা হয় বনু জাদিমা গোত্রের খালিদ ইবনে হিশামের। তিনি যখন জানতে পারলেন যে ঐ ব্যক্তি মারা গেছেন, তখন তিনি ঐ সম্পদের দাবি করেন। তারা তা দিতে অস্বীকার করলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং সেই সংঘর্ষে অউফ ইবনে আব্দ ও ফাকিহ ইবনে মুগিরা নিহত হন। আফফান ও তার পুত্র উসমান কোনমতে পালিয়ে যান এবং নিহতদের মালসম্পদ নিয়ে যান। পরে হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ সুযোগ পেয়ে খালিদ ইবনে হিশামকে হত্যা করে তার পিতার প্রতিশোধ নেন।

কুরাইশ গোত্র এই ঘটনায় প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তারা বনু জাদিমা গোত্রের উপর আক্রমণ করে নিহতদের এবং আর্থিক ক্ষতির প্রতিশোধ নিতে চায়। কিন্তু বনু জাদিমা উত্তর দেয়: "তোমাদের লোকদের হত্যাকাণ্ড একটি ব্যক্তিগত ঘটনা ছিল। এতে আমাদের কোন ইচ্ছাকৃত অংশগ্রহণ ছিল না এবং আমরা সে সম্পর্কে অবগতও ছিলাম না। আমরা নিহতদের ও ক্ষয়ক্ষতির ক্ষতিপূরণ দিতে প্রস্তুত।" কুরাইশ তাদের এই ক্ষমাপ্রার্থনা ও অনুশোচনা মেনে নয়। এটি সীরাত ইবনে হিশাম থেকে বর্ণিত হয়েছে।

এই ঘটনা সমূহ, যাইহোক,কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার পটভূমি তৈরী করে এবং বুঝতে সহায়তা করে কেন শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছিল। এমন একটি ঘটনার উল্লেখ বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া যায়,যা বিরোধের সূচনা করে, এবং এই প্রেক্ষাপটেই খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (রা.) বিতর্কের কেন্দ্রে পরিণত হন। সম্মানীয় সাহাবাগণের মধ্যে অনেকেই এ বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিলেন না।

তথাপি, খালিদের পক্ষ থেকে কোন যুক্তি উপস্থাপন করা যায় না, কারণ তাঁকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছিল- একটি মিশন যেখানে বলপ্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল। অধিকন্তু,অধিকাংশ সাহাবাই তাঁকে সদুপদেশ দিয়েছিলেন,যা দুর্ভাগ্যজনভাবে তিনি গ্রহণ করেন নি। এর ফলে বনু সুলায়ম গোত্র রাতের অন্ধকারে তাদের বন্দিদের হত্যা করার সুযোগ পেয়ে যায়।

ইবনে ইসহাক-এর একটি বর্ণনারূপে বলা হয়েছে যে, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ তাঁর পদক্ষেপের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন, তিনি যখন দেখলেন যে ঐ গোত্র ইসলাম গ্রহণে দ্বিধান্বিত,তখন তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনে হুযাফা সাহমীর সঙ্গে পরামর্শ করেন, যিনি যুদ্ধ শুরু করার পরামর্শ দেন। ইবনে ইসহাক আরও বর্ণনা করেন যে, যাঁরা খালিদের কর্মকাণ্ডকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করতে চেয়েছেন, তাঁদের মতে আব্দুল্লাহ্ ইবন হুযাফা নাকি তাঁকে বলেছিলেন যে, রসুল করীম (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন যারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাবে, তাদের হত্যা করতে হবে।

তবে এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ অভিযানের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা ছিলেন খালিদ, আব্দুল্লাহ্ নয়। ভুলটি ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুল ব্যাখ্যার ফলেই হোক, সেনাপতি হিসেবে খালিদকের এই দায় বহন করতে হবে- বিশেষ করে যখন রসুলুল্লাহ্ (সা.) ঘটনাটি তদন্ত করে তাঁর প্রতি তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তাঁর কার্যকলাপ থেকে প্রকাশ্যে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ঘোষণা করেন।

অতএব, রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর রায়কেই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে। এই ঘটনা কোনভাবেই তুচ্ছ ছিল না; যখন রসুলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন,তখন আর খালিদ সঠিক করেছিলেন না ভুল, তা নিয়ে অজুহাত খোঁজা বা বিতর্ক করা অনুচিত। তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, খালিদ ভুল করেছিলেন এবং তিনি তাঁর কার্যকলাপ থেকে নিজেকে দায়মুক্ত করেছেন- আমাদের জন্য এটুকুই যথেষ্ট। অজুহাত খুঁজতে থাকলে ইসলামে ধর্মীয় স্বাধীনতার যে মৌলিক নীতি রয়েছে, তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রসুলুল্লাহ্ (সা.) যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছেন কেবলমাত্র সরাসরি আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়ায় এবং ইসলাম প্রচারে নম্রতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি বিভিন্ন আরব গোত্রের কাছে একাধিক অভিযান প্রেরণ করেন শুধুমাত্র ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে। এই অভিযানের নেতাদেরকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যুদ্ধ এড়াতে।

জীবনীগ্রন্থ ও মাগাযির ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ, যেমন- সীরাত ইবনে হিশাম ও তাবাকাত ইবনে সা'দ, স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে, এই সকল দল কেবল ইসলামের প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছিল।

আল তাবারিও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) মক্কার আশেপাশের অঞ্চলে এই অভিযানগুলো পাঠিয়েছিলেন যেন তারা লোকদের মূর্তিপূজা থেকে ফিরিয়ে আনেন এবং আল্লাহ্‌র ইবাদতের দিকে আহ্বান করেন। তাদেরকে স্পষ্টভাবে যুদ্ধের কোন অনুমতি দেওয়া হয় নি।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, বর্তমান সময়ের কিছু উগ্রপন্থী আলেম এই জাতীয় ঐতিহাসিক ঘটনাকে সহিংসতা ও হত্যার বৈধতা প্রমাণে ব্যবহার করেন, কিন্তু রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশ একেবারে স্পষ্ট: যারা যুদ্ধ শুরু করে না, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো না। এটি একপ্রকার অন্যায়।

সহীহ বুখারীর হাদীস দ্বারা আরও নিশ্চিত হয় যে, খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে বনু জাযিমা গোত্রের কাছে কেবল ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছিল। রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশ স্পষ্ট ছিল: 'ফা দাআহু ইলাল ইসলাম'। তিনি তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানালেন।" এই নির্দেশ পালন করতেই খালিদ তাদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। কিন্তু গোত্রটি আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে পারে নি এবং এর পরিবর্তে বলে বসে: "আমরা আমাদের ধর্ম পরিবর্তন করেছি।" এই বক্তব্য গোটা গোত্রের ছিল না- কারণ তাদের অনেকেই পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল- বরং এটি একটি নির্দিষ্ট পরিবারের পক্ষ থেকে এসেছিল, যারা প্রতিশোধের আশঙ্কায় অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল। পরাজিত হয়ে তারা 'সাবা'না বলে আত্মসমর্পণ করে- এটি ইসলাম গ্রহণের একটি ইঙ্গিতবাহী শব্দ। বুখারীর বর্ণনাটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং কেবলমাত্র নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল তথ্যই তিনি গ্রহণ করেছেন। এই বর্ণনায় জাহদাম তার লোকদের পরামর্শ দেন যে তারা অস্ত্র না ফেলে, বরং প্রতিরোধ করে, কারণ তিনি পূর্বের রক্তক্ষয়ী ঘটনার কারণে প্রতিশোধের আশঙ্কা করছিলেন।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় জাহদামের এই কথাটি উদ্ধৃত হয়েছে: 'হে বনু জুযাইমা! মনে রেখো, এটা খালিদ। অস্ত্র জমা দিলে, বন্দি করা হবে-তারপর শিরচ্ছেদ।"

তার গোত্রের কিছু সদস্য তাকে ভর্ৎসনা করে বলেন, "তুমি কি রক্তপাত চাও? লোকেরা তো ইতিমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং অস্ত্র ফেলে দিয়েছে। যুদ্ধ শেষ, এখন শান্তি বিরাজ করছে।" তারা তাকে বোঝাতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তার হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয়। এরপর খালিদের নির্দেশ অন্যরাও অস্ত্র জমা দেয়। সীরাত ইবনে হিশাম-এ এভাবেই ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।

এই বক্তব্য স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, জাহদামের আশঙ্কা অমূলক ছিল না। মনে হয়, নবী করীমের (সা.) সম্মানীয় সাহাবাগণ কিছু সময় ঐ গোত্রে অবস্থান করেছিলেন, যাতে তারা সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী সদস্যদের ইসলামী শিক্ষাদান করতে পারেন। এটি সেই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যেখানে বলা হয়েছে- حَتّٰى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَ خَالِدٌ (অর্থাৎ, "যতক্ষণ না একদিন খালিদ আদেশ দেন) তাঁদের এই অবস্থানকালে একটি অনভিপ্রেত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, যার ফলে গোত্রের কিছু সদস্যের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়, এবং সেই সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে তারা বন্দী হন। যখন এসব বন্দি মুজাহিদদের হস্তান্তর করা হয়, তখন এটি অস্বাভাবিক নয় যে, কেউ পূর্বের রেষারেষির সুযোগ নিয়ে প্রতিশোধস্বরূপ তাদের হত্যা করে থাকে।

ইবনে হিশাম, ইবরাহীম ইবনে জাফর মাহমুদি হতে বর্ণিত সূত্রে, নবী করীম (সা.)-এর একটি স্বপ্ন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর ব্যাখ্যার উল্লেখ করেছেন, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। স্বপ্নে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) খেজুর, যব ও ঘৃত দ্বারা প্রস্তুত মালিদার কয়েকটি লুকমা গ্রহণ করেন, যেগুলো ছিল সুস্বাদু। তবে শেষের একটি লুকমা তাঁর কণ্ঠনালীতে আটকে যায়, এবং হযরত আলী (রা.) সেটি হাত দিয়ে বের করে দেন। হযরত আবু বকর (রা.) সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেন যে, এটি একটি তবলীগি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং তিনি পরামর্শ দেন যে হযরত আলী (রা.)-কে পাঠানো উচিত, যাতে খালিদের ত্রুটির সংশোধন হয়ে যায়।

এই স্বপ্ন থেকেও বোঝা যায় যে ঘটনাটি বনু জুযাইমা-র একটি সীমিত অংশ এবং নির্দিষ্ট কয়েকজন বন্দীর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। এমন নয় যে সব বন্দীকে কেবল 'সাবা'না' (আমরা ধর্ম পরিবর্তন করেছি) বলার কারণে হত্যা করা হয়েছিল। বাস্তবিকপক্ষে, এই ব্যক্তিরা প্রকৃত অর্থে ইসলাম গ্রহণ করেনি, এবং পূর্বের শত্রুতা ও প্রতিশোধের আশঙ্কা তাদের মনে এতটাই তীব্র ছিল যে আত্মরক্ষার জন্য তারা অস্ত্র তুলে নেয়।

খালিদের সেনাদলে অন্তর্ভুক্ত সুলায়ম ইবনে মানসুর ও মুদলাজ ইবনে মুররাহ গোত্রের কিছু সদস্যের মনে ছিল প্রতিশোধের আশঙ্কা, যার ফলে তারা সক্রিয়ভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়। পরিণতিতে,সুলায়ম গোত্রের সদস্যরাই রাতের অন্ধকারে তাদের বন্দীদের হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অপরদিকে, মুহাজির ও আনসারগণের কেউই তাদের বন্দীদের হত্যা করে নি; বরং তারা তাদের মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশনা ও তাঁর উত্তম আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন।

এই ব্যাখ্যাটি শাহ ওলিউল্লাহ্ দেহলভীর লিখিত সহীহ বুখারী-এর টীকায় পাওয়া যায়। তিনি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাজ্ঞ মন্তব্য যুক্ত করেন, যা সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করে যে, হযরত খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা.)-এর মধ্যে কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। বরং এটি ছিল একটি ইজতিহাদী (স্বাধীন ও নিজস্ব মতামত) ভুল; তিনি তাড়াহুড়ো করে একটি সিদ্ধান্ত নেনন এবং পরে সেনাপতি দায়িত্বে থাকায়, তিনি সম্পূর্ণ পরিস্থিতির দায়ভার বহন করেন।

এ কারণে রসুলুল্লাহ্ (সা.) খালিদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ঘটনার সঙ্গে নিজের সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করেন। পরে রসুল করীম (সা.) পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখেন, এবং তখন প্রতীয়মান হয় যে এই হত্যাকাণ্ড একটি ভুল বোঝাবুঝির কারণে ঘটেছিল। ফলে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) কিসাস (প্রতিশোধমূলক) বিচার না দিয়ে রক্তমূল্য (দিয়া) দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর অবস্থান ও ব্যাখ্যা পেশ করলে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) কেবল তাঁকে ক্ষমা করেন নি, বরং কয়েক দিনের মধ্যেই আসন্ন হুনায়নের যুদ্ধে অগ্রবর্তী বাহিনী ও অশ্বারোহী দলের সেনাপতি হিসেবে তাঁকে নিয়োগ দেন। যদি রসুলুল্লাহ (সা.)-এর অসন্তোষ এত গভীর হতো, তবে তিনি নিশ্চয়ই খালিদকে আরেকটি বাহিনীর নেতৃত্বে নিযুক্ত করতেন না। এই ঘটনা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) হযরত সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

তাছাড়া, আরও দুটি সারিয়া-এর সঙ্গেও তাঁর সম্পৃক্ততার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ পাওয়া যায়।

মহানবী (সা.) হযরত হিশাম বিন আল আস (রা.) -এর নেতৃত্বে এই সেনাভিযান প্রেরণ করেন, যা দুই শত সৈন্য নিয়ে গঠিত ছিল। এই বাহিনীকে ইয়ালামলাম নামক স্থানের দিকে প্রেরণ করা হয়েছিল, যা মক্কার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত এবং মক্কা ও তায়েফের মধ্যে দুই রাতের পথ দূরত্বে।

## উরানাহ সেনাভিযান

উরানাহ হল এক উপত্যকা, যা আরাফাতের সামনে অবস্থিত। বর্ণিত হয়েছে যে নবী করীম (সা.) হযরত খালিদ বিন সাঈদ আল আস (রা.) কে তিনশ সৈন্যের একটি অভিযানের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। তবে এ অভিযান কেবলমাত্র মুহাম্মদ বিন উমর আল ওয়াকিদী উল্লেখ করেছেন, অন্য কোন প্রসিদ্ধ জীবনীকার এটি বর্ণনা করেন নি। অতএব, এর সত্যতা সন্দেহজনক এবং এর বিষয়ে আর কোন বিস্তারিত তথ্যও পাওয়া যায় না। একজন জীবনীকার শুধু মন্তব্য করেছেন যে, তাঁর জ্ঞানের সীমার মধ্যে কোন ঐতিহাসিকই উরানাহ পর্যন্ত হাযরত খালিদ বিন সাঈদ বিন আল-আসের নেতৃত্বাধীন এ বাহিনীর কার্যক্রমের বিবরণ দেন নি। তবে এতে কোন দ্বিমত নেই যে এ অভিযানটি হুযাইল গোত্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল,যারা সেই সময় উরানাহ অঞ্চলে বসবাস করছিল।

(সূত্র: আল-লু'লু আল মাকনুন: সীরাত এনসাক্লোপেডিয়া, খণ্ড-৯, পৃ: ২২৪) (গাযওয়ায়ে হুনাইন-বাশমীল, পৃ: ৩৫-৩৭)

যে কোন অবস্থায় এ থেকে মহানবী (সা)-এর চরিত্রের আরেকটি দিক সুস্পষ্টভাবে উন্মোচিত হয়: তিনি কখনোই কঠোরতা অবলম্বন করেন নি। ইসলামের শত্রুরা যে অভিযোগ করে যে তিনি যুদ্ধসমূহে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন- তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বরং কোথাও অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল ঘটলে তিনি তাতে প্রবল অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

মহানবী (সা.)-এর এর অবশিষ্ট গাযওয়াত ও সারায়াগুলোর আলোচনা ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে করা হবে।

********

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 9 Oct 2025 Issue No.41

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

# নিকাহ্ বন্ধন

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে হযরত মুগাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে তিনি এক জায়গায় নিকাহর প্রস্তাব দিলে আঁ হযরত (সা.) বলেন, 'মেয়েটিকে দেখে নাও, কেননা এভাবে দেখলে তোমার এবং তার মাঝের বোঝাপড়া এবং ভালবাসা সৃষ্টির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

(তিরমিযী, কিতাবুন নিকাহ)

এই অনুমতিকেও বর্তমান সমাজে কিছু মানুষ ভুল বুঝেছে এবং এর এই অর্থ বের করেছে যে একে অপরকে বোঝার জন্য সব সময় আলাদা বসে সময় কাটাতে হবে, ঘুরে বেড়াতে হবে। ..... বাড়িতেও ঘন্টার পর ঘন্টা পৃথক হয়ে একসঙ্গে বসে থাকে। এটিও ঠিক নয়। এর অর্থ হল মুখোমুখি হয়ে একে অপরের চেহারা দেখে পরস্পরকে বুঝতে সহজ হয়। কথা বলার সময় অনেক স্বভাব সম্পর্কে জানা যায়। এছাড়াও বর্তমান যুগে পরিবারের সদস্যদের সামনে খাবার খেলেও কোনও অসুবিধা নেই। খাওয়ার সময়েও স্বভাবের অনেকগুলি দিক প্রকাশ পায়। আর যদি কোনও বিষয় অপছন্দনীয় মনে হয়, তবে তা প্রথমে প্রকাশ পাওয়াই উত্তম, যাতে পরবর্তীতে বিবাদের উৎপত্তি না হয়। আর যদি উন্নত স্বভাব-চরিত্র হয়, তবে এই সম্পর্কের মধ্যে বোঝাপড়া এবং ভালবাসাও বৃদ্ধি পায়। ... কখনও কখনও অনেকে সম্পর্ক হওয়ার পর ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করে। তাদের মুখোমুখি সাক্ষাতের ফলে এবং একে অপরের চালচলন দেখার ফলে এমন সুযোগ আসবে না। কেননা তারা একে অপরের সম্পর্কে অবগত থাকবে। কিন্তু অপরপক্ষে অনেকে এর বিপরীতেও অনেক বাড়াবাড়ি করে। ছেলে ও মেয়ে বিয়ের আগে কিম্বা দেখাশোনার সময় পরস্পরের সামনে বসতেও পারে না। এটিকে তারা আত্মাভিমানের নাম দেয়। অতএব ইসলামের শিক্ষা হল ভারসাম্য বজায় রাখার শিক্ষা। না কম না বেশি। এই নীতিই অনুসৃত হওয়া কাম্য। এরই মাধ্যমে সমাজে শান্তি বজায় থাকবে, কলহ ও বিশৃঙ্খলা দূরীভুত হবে।"

(খুতবাতে মাসরূর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯৩৪-৯৩৫)

## হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা

কনের বাড়ীতে বিবাহ ভোজ সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, 'যদি মেয়ে পক্ষের সাধ্য ও সামর্থ থাকে তাহলে সীমিত গন্ডিতে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ঋণ করে অন্যের দেখা-দেখি কখনও বড় ভোজের ব্যবস্থা করা উচিত নয়। সবকাজে তরবিয়তের দিকটা সামনে রাখা চাই। যাদের আর্থিক সামর্থ নেই তাদের কোনভাবেই হীনমন্যতায় ভোগা উচিত নয়।'

* ফটো সম্পর্কে হুযুর (আই.) বলেন, বিয়ের জন্য যদি ফটো দিতে হয় দিন কিন্তু তার পরে ফেরত নিতে হবে। পত্রিকায় কোন আহমদী মহিলার ছবি ছাপা ঠিক হবে না।

সূত্র: পাক্ষিক আহমদীয়া, ৩১ শে জুলাই, ২০১৩

(১ম পাতার শেষাংশ...)

অতএব, এ দাবি করা যে- যিনি আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.) এর নিকট আনুগত্যের শেকল নিজের গলায় পরিধান করেছেন, তাঁদের হাতে বয়আত করেছেন এবং তাঁদের সঙ্গে কাজ করেছেন- তবুও তিনি অন্তরে বিশ্বাস করতেন যে খিলাফত তাঁরই অধিকার (আল্লাহর নির্দেশে, শুধু যোগ্যতার কারণে নয়)- এটি আসলে এ দাবির সমান যে হযরত আলী (রা.) বাহ্যিকভাবে এক কথা বলতেন, অথচ অন্তরে অন্য কিছু লুকিয়ে রাখতেন (নাউযুবিল্লাহ)। হযরত আলী (রা.)-এর ব্যাপারে এমন ধারণা পোষণ করাই গুনাহ, আর একে সত্য বলে মানা তো আরও বড় অপরাধ। তাই তাঁর নিজের আচরণই এই দাবিকে মিথ্যা প্রমাণ করে।

তদুপরি, কুরআনের আয়াত- নিশ্চয়ই মুমিনগণ সফল হয়েছে।" (সূরা মুমিনুন: ১)- এটিও শিয়াদের দাবিকে খণ্ডন করে। করণ, এখানে বলা হয়েছে যে যেসব মুমিনদের মধ্যে পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত গুণাবলী রয়েছে, তারাই উদ্দেশ্যে সফল হবে। 'আফলাহা' শব্দটি নিজের লক্ষ্য অর্জন করা ও তাতে বিজয়লাভের অর্থ বহন করে। সুতরাং, যদি শিয়াদের মতে আবু বকর (রা.) , উমর (রা.) ও উসমান (রা.) খিলাফত কামনা করে থাকেন এবং বাস্তবেই খলীফা হয়েছেন, তবে এটি স্পষ্ট যে তাঁরা প্রকৃত মোমেনদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাঁদেরকে আল্লাহ্ দ্বীন ও রাজনীতির নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন, তাঁদের বিশ্বনেতা বানিয়েছিলেন। অন্যথায় মানতে হবে যে নবীর উইল থাকা সত্ত্বেও হযরত আলী (রা.) নিজেই কামনা করেছিলেন যে আবু বকর (রা.) খলীফা হোন, এবং আল্লাহ্ তাঁর কামনা পূর্ণ করেছিলেন, ফলে আবু বকর (রা.)সফল হয়েছিলেন। অথচ পরে হযরত আলী (রা.)-এর অনুসারীরা তাঁর বিরুদ্ধেই গালি দিতে শুরু করে।

সুতরাং 'কাদ আফলাহাল মুমিনুন' আয়াতটি শিয়াদের উভয় ধারণাকে খণ্ডন করে: প্রথমত, যে নবীর সাহাবীদের অধিকাংশ (নাউযুবিল্লাহ্) মুনাফিক ছিলেন আর অল্প কিছুজনই সত্যিকারের মোমেন ছিলেন; দ্বিতীয়ত, যে খিলাফতের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন হযরত আলী (রা.), আর তাঁর অধিকার আবু বকর, উমর ও উসমান (রা.) হরণ করেছিলেন।

(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১২২)

## সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) প্রদত্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি পথ-নির্দেশনা।

**"আমি বারবার পিতামাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছি, সন্তানরা বাইরে কেমন পরিবেশে ওঠা-বসা করে তার প্রতিও দৃষ্টি রাখুন আর ঘরে যখন তারা টিভির প্রোগ্রাম দেখে বা ইন্টারনেট ইত্যাদি ব্যবহার করে তখনো সজাগ দৃষ্টি রাখুন।"**

(খুতবা জুমআ, ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৩,বায়তুল ফুতুহ, লন্ডন)

## মহান আল্লাহ্‌র বাণী

**নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্‌কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়।** (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Abu Bakar Siddiq & Manjuara Mandal, From- Abu Hasan Mondol . Bithari, 24 PGS (N)

## ১৩০ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২৫ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৬, ২৭ ও ২৮ শে ডিসেম্বর ২০২৫ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা। (নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir